ইসলাম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইসলাম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
ড. আমীর হোসেন
মোঃ আবু হানিফ
ড. মোহাম্মদ আবুল কাশেম
মোঃ নাজমুল হাছান
মোঃ মোস্তফা কামাল
নাজমুল হাসান জুন্নুন
ড. মোঃ ইকবাল হায়দার
উম্মে কুলসুম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ...., ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

প্রচ্ছদ

মঞ্জুর আহমেদ

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

মো: আ: হান্নান বিশ্বাস

মো: সাদ্দাম হোসাইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী,

নতুন শিক্ষাক্রমে সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তরণে তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন!

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এর আলোকে প্রণীত 'ইসলাম শিক্ষা' এ নতুন বইটি হাতে পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি আনন্দিত। ইতোমধ্যে তুমি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রমের 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করেছ। এ পাঠ্যপুস্তকের নতুনত্বের দিকসমূহ এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কেও তোমার পূর্ব ধারণা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। তোমাকে আবারও কিছু কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি পড়ে তোমাকে কেবল ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলেই চলবে না। তুমি যা শিখবে সে অনুসারে তোমাকে কাজ করতে হবে। শিখন মূল্যায়নে তুমি কতটা 'জানো' কেবল তার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তুমি কতটা 'পারো' তার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

ইসলাম শিক্ষার নতুন কোন বিষয়বস্তু তুমি শিখবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আর সে অভিজ্ঞতা তুমি অর্জন করবে নানা মাধ্যমে। শিক্ষক তার পরিকল্পনা অনুসারে তোমার অভিজ্ঞতা লাভের প্রেক্ষাপট বা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করবেন এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তোমাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবেন। আবার কখনও বা তা হাতে-কলমে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা অর্জনের জন্য তোমাকে নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকতে হবে। শিক্ষকের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে দেয়া এবং শিক্ষক কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন কাজ তোমাকে যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। আশা করা যায় এ পদ্ধতি অবলম্বনে তুমি ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি ইসলামি জীবনবিধানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, তাৎপর্য ও এর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারবে। সহজ ও আনন্দদায়ক উপায়ে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে কাংখিত দক্ষতা ও পারদর্শীতা অর্জন করতে পারবে।

আশা করা যায় এ পাঠ্যপুস্তকটির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিগন্ত আরো প্রসারিত হবে। মহান আল্লাহ আলোর পথে তোমার চলার পথ সহজ করে দিন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
অধ্যায় ১ :	আকাইদ	১
	আল্লাহর পরিচয়	১
	রাসুলগণের প্রতি ইমান	৬
	খতমে নবুওয়াত	১১
	ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদি (আ.) এর আগমন	১৩
	আখিরাতের প্রতি ইমান	১৫
	কিয়ামত	১৫
	তাকদিরের প্রতি ইমান	১৯
	শাফা'আত	২১
	শিরক	২৪
অধ্যায় ২ :	ইবাদাত	২৮
	সালাত	২৮
	সাওম	৩৫
	যাকাত	৪৭
	হজ	৫৫
অধ্যায় ৩ :	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৭৩
	আল কুরআনের পরিচয়	৭৩
	তাজবিদ	৭৯
	সূরা আল-কাওসার	৮৪
	সূরা আল-মাউন	৮৬
	সূরা কুরাইশ	৮৯
	সূরা আল-কারিয়াহ	৯২
	সূরা যিলযাল	৯৫
	আয়াতুল কুরসি	৯৭
	আল হাদিস	১০১
অধ্যায় ৪ :	আখলাক	১১০
	আখলাকে হামিদাহ	১১১
	আখলাকে যামিমাহ	১২৪
অধ্যায় ৫ :	আদর্শ জীবন চরিত	১৩৪
	মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	১৩৪
	হযরত ইবরাহিম (আ.)	১৪৩
	হযরত উসমান (রা.)	১৪৬
	হযরত ফাতিমা (রা.)	১৪৮
	হযরত শাহ জালাল (রহ.)	১৫০
অধ্যায় ৬ :	পরমত সহিষ্ণুতা	১৫২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমরা অতিথি মহোদয়ের সাথে আলোচনা, মতবিনিময়ের মাধ্যমে আকাইদের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে সুন্দর ও স্পষ্ট একটি ধারণা অর্জন করতে পেরেছো। আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের খাতায় লিখে রেখেছো। চলো, এখন শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি/তোমরা একক/জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখ।

দলগত কাজ

তোমরা আজকের আলোচনা থেকে আকাইদ সম্পর্কে কি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ, দলে আলোচনা করে লিখ।

আল্লাহর পরিচয়

প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি কি মনে করো একটি পিঁপড়ার পক্ষে এ পৃথিবীর বাস্তব রূপ ও এর বিশালতা দেখা সম্ভব? হয়তো তুমি বলবে, 'নিশ্চয়ই না'। একটি সামান্য পিঁপড়ার পক্ষে এটি যেমন অসম্ভব, তেমনি এ বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রকৃত পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক জানা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি তাঁর সৃষ্টিরাজির কোনো কিছুকেই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁর এ সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিচয়, নিদর্শন ও মহিমা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন আমাদের বসবাসের এই জমিন, মাথার উপরের আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, আকাশে চলমান মেঘমালা, বায়ুপ্রবাহ, রাত এবং দিনের পরিবর্তন; এসব নিয়ে আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করি তাহলে এসবের মাঝে আমরা মহান আল্লাহর অজস্র মহিমা ও নিদর্শন খুঁজে পাই। আবার পবিত্র

কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত 'আল-আসমাউল হুসনা'র মাঝেও মহান আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে। তোমার অবশ্যই মনে আছে, মহান আল্লাহর ওপর ইমান প্রসঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তুমি আল্লাহর গুণের পরিচয় জানতে আল আসমাউল হুসনা থেকে কয়েকটির বিবরণ জেনেছো। এ শ্রেণিতে আমরা আরো কয়েকটি আল্লাহর গুণবাচক নাম সম্পর্কে আলোচনা করবো। তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক।

আল্লাহু তাওয়াবুন (اَللّٰهُ تَوَّابٌ)

তাওয়াবুন (تَوَّابٌ) অর্থ তাওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী। এটি মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আল্লাহ নিজেই তাঁর নাম রেখেছেন 'আত-তাওয়াব' (اَلتَّوَّابُ)। তাওয়াব হলো যিনি সর্বদা তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন। অতএব যারা আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করে, তিনি তাদের তাওবা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহই তাঁর বান্দাকে তাওবা করার তৌফিক দান করেন। ফলে বান্দা গুনাহের কাজ থেকে ফিরে আসে। সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে এবং উক্ত গুনাহের কাজে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে। আর এভাবে বান্দা যখন খাঁটি তাওবা করে তখন আল্লাহ তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন—

وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১০৪)

মহান আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২২২)

প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যেন দিনের পাপী ব্যক্তিরা রাতে তাওবা করে নিতে পারে। আবার তিনি দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের পাপী ব্যক্তিরা দিনে তাওবা করে নিতে পারে। যখন কেউ অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং সৎ কাজ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার মন্দ কাজকে ভালো দিয়ে পরিবর্তন করে দেন।

জোড়ায় কাজ

'আল্লাহু তাওয়াবুন' মহান আল্লাহর এই নামের শিক্ষা তোমার/তোমাদের কর্মে বাস্তবায়নে কী কী করতে পারো তার একটি তালিকা তৈরি করো।

আল্লাহু কাদিরুন (اَللّٰهُ قَدِيْرٌ)

কাদিরুন (قَدِيْرٌ) অর্থ সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমতাধর। এটি মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আল-কাদির হলেন এমন সত্তা, যিনি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আর এগুলো তিনি সুনিপুণভাবে পরিচালনা করেন। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। কিয়ামতের দিন পুনরায় তিনি সকলকে জীবিত করবেন আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিবেন এবং পাপীদেরকে শাস্তি দিবেন। তিনি এমন এক সত্তা যিনি কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করলে শুধু কুন (كُنْ) বা 'হও' বলেন, সাথে সাথে তা হয়ে যায়। তিনিই অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। আর তিনি যাকে যেভাবে চান সেভাবেই পরিবর্তন করেন। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। সবকিছুর ওপর তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۟

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০)

আল্লাহু ওয়াদুদুন (اَللّٰهُ وَدُوْدٌ)

ওয়াদুদ শব্দের অর্থ পরম স্নেহপরায়ণ, প্রেমময়, প্রেমাষ্পদ। 'আল্লাহু ওয়াদুদুন' অর্থ আল্লাহ পরম প্রেমময় ও স্নেহপরায়ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۟

অর্থ: 'এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, প্রেমময়।' (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত: ১৪)

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি ভালোবেসেই তাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই বান্দার দায়িত্ব হলো তাঁর বন্দেগি করা এবং যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা।

সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এজন্য মহানবির একটি উপাধি 'হাবিব'। মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হলো তাঁর প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ (সা.)-কে ভালোবাসা। তাঁর আদর্শ পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।' (সূরা আলে- ইমরান, আয়াত: ৩১)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এতই ভালোবাসেন যে, তারা পাহাড়সম গুনাহ করার পর তাওবা করলে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি তাওবাকারীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। তাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা কখনই বন্ধ করেন না। কারণ তাঁর স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার কোনো সীমা নেই।

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদুদ নাম থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি যে, তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল।

আমাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। আমরা যতই অন্যায় ও অপরাধ করি না কেন, আল্লাহর কাছে ফিরে আসলে তিনি আনন্দিত হন, আমাদের ক্ষমা করে দেন। তিনি আমাদের কল্যাণ চান। আমাদেরকে জান্নাত দান করতে চান। তাই আমরা আল্লাহর ইবাদাত করবো। তাঁর যাবতীয় আদেশের অনুসরণ করবো। তাঁর হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে ভালোবাসবো। আল্লাহর জন্যই সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ভালোবাসবো।

আল্লাহু জাব্বারুন (اَللّٰهُ جَبَّارٌ)

জাব্বার শব্দের অর্থ মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী ইত্যাদি। আল্লাহু জাব্বারুন অর্থ আল্লাহ পরাক্রমশালী। মহান আল্লাহর সামনে সবাই পরাভূত ও দুর্বল। তিনিই সবচেয়ে মহিমান্বিত। অহংকার করার একচ্ছত্র অধিকার তাঁরই। একই সাথে বান্দাদের প্রতি তিনি পরম স্নেহশীল ও দয়ালু। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ গুণবাচক নামটি একবার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।' (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩)

মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর আদেশ ও ইচ্ছাই চূড়ান্ত। কেউ তাঁকে পরাভূত করতে পারে না। বরং তিনিই সবার উপর ক্ষমতাবান। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহর এ গুণবাচক নামটি আমাদেরকে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখতে শেখায়। আমরা বুঝতে পারি, যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত, তাই তাঁর ইচ্ছায় নিজেদের সমর্পিত করার মধ্যেই যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে।

এটি আমাদের আত্মনির্ভরশীল ও সাহসী হতে শেখায়। আল্লাহু জাব্বারুন নামের বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করে। যাবতীয় বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে আপন লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করে অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহকেই সবচেয়ে বড় মনে করে।

আমরা মহান আল্লাহর এ গুণটি উপলব্ধি করবো। তাঁকে সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হিসেবে জানবো। সকল কাজে তাঁর কাছে সাহায্য চাইবো। অন্যায় ও খারাপ কাজ পরিহার করবো।

আল্লাহু সামাদুন (اَللّٰهُ صَمَدٌ)

সামাদ অর্থ অমুখাপেক্ষী, চিরন্তন, অবিনশ্বর ইত্যাদি। আল্লাহু সামাদুন অর্থ হলো আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলার কারও প্রয়োজন নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সৃষ্টিজগতের সবকিছু আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ

অর্থ: আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ২)

পৃথিবীর সবকিছু অস্তিত্বহীন ছিলো। মহান আল্লাহই সবকিছুকে অস্তিত্বে এনেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই এক মুহূর্ত টিকে থাকতে পারে না। সকল সৃষ্টি জন্ম-মৃত্যু, বেড়ে ওঠা, পানাহার, সুস্থতা ইত্যাদির জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনায় তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না। তাঁর হুকুমই চূড়ান্ত। কেউ তাঁর হুকুমের বাইরে যেতে পারে না। তিনি তাঁর গুণাবলি ও কর্মে পরিপূর্ণ, নিখুঁত। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হওয়ার পর শুধু তিনি থাকবেন। আসমান-জমিনের সবকিছু তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করে। তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেই সবাই টিকে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই তার নিকট প্রার্থী।' (সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৯)

মহান আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছু মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। মহান আল্লাহর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এমনকি মানুষের ইবাদাত-বন্দেগি, তাসবিহ-তাহলিলেরও তিনি মুখাপেক্ষী নন। মানুষের নিজেদের কল্যাণ ও প্রয়োজনেই তাঁর ইবাদাত-বন্দেগি করা উচিত। মানুষ আল্লাহর অবাধ্য হলে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। এমনকি অনুগত বান্দা হলেও তাঁর বিশেষ কোনো লাভ নেই। তাঁর আহার-নিদ্রা, বিশ্রাম কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এক কথায় তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষী ও দোষমুক্ত একমাত্র সত্তা।

আমরা মহান আল্লাহর এই গুণটি সুন্দরভাবে অনুধাবন করবো। একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হবো। তাঁর উপর ভরসা করতে শিখবো।

জোড়ায় কাজ

মহান আল্লাহর পরিচয় তথা আসমাউল হুসনা জানার মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে তোমার নতুন যে যে বিশ্বাস তৈরি হলো:

১. আমরা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তাহলে আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।
২. ....
৩. ....
৪. ....

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

(প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের প্রতিফলন ডায়েরিতে নিম্নোক্ত শিরোনামে বাড়িতে লিখবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের যেমন: মাতা-পিতা/দাদা-দাদি/বড় ভাই-বোন/ সহপাঠী প্রমুখের সহায়তা নিতে পারো।)

মহান আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত বিশ্বাসের ফলে আমার চরিত্রে যেসব গুণের প্রতিফলন ও চর্চা অব্যাহত রাখব।

১. আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফ চাইলে, তিনি আমাদের মাফ করে দেন। আমরাও যথাসম্ভব অন্যকে মাফ করে দিবো।

২. ....

৩. ....

৪. ....

রাসুলগণের প্রতি ইমান

মানব জাতিকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। রাসুলগণ আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি। তাঁদের প্রচারিত বাণী আল্লাহরই বাণী। এই বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো রাসুলগণের প্রতি ইমান। রাসুলগণের প্রতি ইমান বলতে নবি-রাসুল উভয়কে বুঝানো হয়েছে। রাসুল শব্দটি রিসালাত শব্দ থেকে এসেছে। রিসালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ চিঠি, বার্তা, সংবাদ ইত্যাদি। সুতরাং রিসালাত বলতে আল্লাহ তা'আলার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে বোঝায়। এ দায়িত্ব পালনকারীকে রাসুল বলা হয়। রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসুল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও। তাঁদের সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫)

রাসুলগণের প্রতি ইমান আনার অপরিহার্যতা

ইমানের পূর্ণতার জন্য ইসলামের ৭টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুতরাং রাসুলগণের প্রতি ইমান না আনলে তাওহিদে বিশ্বাস পূর্ণ হবে না। নবি-রাসুলগণের কাউকে বিশ্বাস করা আর কাউকে অবিশ্বাস করা যাবে না। বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবি-রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। সবাইকে যথাযথ সম্মান দিতে হবে। তাঁদের সবার

প্রতি ইমান আনতে হবে। তাঁদের প্রতি ইমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا ○

অর্থ: 'তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫)

নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক তৈরি করা, মানুষকে সরল সঠিক পথ দেখানো, পরকাল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা, আল্লাহর বিধি বিধান মেনে চলার প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ভ্রান্ত পথ ও মত দূর করে সত্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ
وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

অর্থ: 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪)

নবি-রাসুলগণের গুণাবলি

নবি-রাসুলগণ মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত। তিনি তাঁদের সব ধরনের চারিত্রিক ও মানবিক দোষত্রুটি থেকে রক্ষা করেন। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন মাসুম বা নিষ্পাপ। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তাঁরা ছিলেন আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত'। (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৪৭)
দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যের প্রতি নবি-রাসুলগণের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁরা ছিলেন মিষ্টভাষী, ভদ্র, বিনয়ী, ধৈর্যশীল, সহনশীল, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, প্রতিকূল পরিবেশে তাওহিদের দাওয়াত প্রদানকারী এবং সৎকর্মশীল। আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসুলগণের গুণাবলি উল্লেখ করে বলেন, 'এবং স্মরণ করুন ইসমা'ইল, ইদরিস ও যুল-কিফল-এর কথা, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল; এবং তাঁদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ'। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৫-৮৬)

নবি-রাসুলগণের অনুসরণ

মানব জাতিকে হেদায়েতের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ ওহির মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করতেন। তাঁরা একদিকে ছিলেন সত্য ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, অন্যদিকে ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। নবি-রাসুলগণ মানবজাতিকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সে অনুযায়ী আমল করবে তারা মৃত্যুর পর মহা সুখের জান্নাত লাভ করবে। আর যারা নবি-রাসুলের অনুসরণ না করে পাপ কাজে লিপ্ত হবে তাদের জন্য পরকালে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই নবি-রাসুলের অনুসরণ করা সবার ইমানি দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

অর্থ: 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭১)

আমরা সবাই আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করবো।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ও নবিগণের মর্যাদা

আল্লাহর প্রেরিত নবি-রাসুলগণ সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নবি-রাসুলদের একেক জনকে মহান আল্লাহ বিশেষ বিশেষত্ব প্রদান করেছেন। যেমন হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা 'খলিল' বা বন্ধু বলে আখ্যায়িত করছেন। হযরত সুলাইমান (আ.) এবং হযরত দাউদ (আ.)-কে নবুওয়াত ও বাদশাহী দান করেছিলেন। হযরত আইয়ুব (আ.)-কে ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছিলেন। হযরত মুসা (আ.)-কে তুর পাহাড়ে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি ছিল 'রুহুল্লাহ'। তিনি দোলনায় থাকাকালেই কথা বলেছেন। এ ছাড়া মহান আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারতেন। এভাবেই সব নবি-রাসুলকে আল্লাহ তা'আলা আলাদা আলাদা মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

অর্থ: 'এ রাসুলগণ, তাঁদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৩)

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সবার উপরে বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল ছিলেন। তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কেবল এ পৃথিবী আর মানুষই নয়; বরং জগৎসমূহের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সবার ওপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ رَفَعۡنَا لَکَ ذِکۡرَکَ ؕ

অর্থ: 'এবং আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি।' (সূরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত: ৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَآ أَرۡسَلۡنٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ○

অর্থ: 'আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের নেতা হবো। আর এ কথা গর্ব করে বলছি না'। তিনি আরো বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবো। আর আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে'। (তিরমিযি)

নবি-রাসুলগণের মু'জিযা

সকল যুগে রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ ও হেদায়েতের পথ সুগম করে ইমানি সফলতার জন্য মু'জিযার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসুলগণকে তাঁদের নবুওয়াতের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে অলৌকিক প্রমাণ বা মু'জিযা দান করেছেন। কিন্তু তাঁদের সকলেরই মু'জিযা ছিল তৎকালীন সময়ের জন্য। তাঁদের তিরোধানের সাথে সাথে তাঁদের মু'জিযা দেখার কোনো উপায় ছিল না। যেমন- হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠি সাপে পরিণত হতো, হযরত ঈসা (আ.) 'কুম বিইযনিল্লাহ' (আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও) বললে মৃত ব্যক্তি জীবিত হতো; মাটির টুকরায় ফুঁ দিলে পাখি হয়ে উড়ে যেত; অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি লাভ করতো; কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতো। এ সবই তাঁদের মু'জিযা বা অনন্য নিদর্শন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনে অসংখ্য মু'জিযা সংঘটিত হয়েছিল। যেমন তাঁর পবিত্র হাতের ইশারায় চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, মিরাজের রাতে উর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করা এবং আল্লাহর দিদার লাভ করা, গাছ-পাথর কর্তৃক তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি। তাঁর সবচেয়ে বড় মু'জিযা আল-কুরআন, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত ও বিদ্যমান থাকবে।

নবি-রাসুলের পার্থক্য

নবি শব্দের অর্থ সংবাদবাহক। আর রাসুল শব্দের অর্থ দূত। নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে নতুন শরিয়ত দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান, তাঁকে রাসুল বলা হয় । আর যাকে নতুন শরিয়ত না দিয়ে পূর্বের রাসুলের শরিয়তই প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, তাঁকে নবি বলা হয়। প্রত্যেক রাসুলই

নবি, কিন্তু প্রত্যেক নবিই রাসুল নন। নবুওয়াতের ধারায় প্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.) আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

নবি-রাসুলের সংখ্যা

নবি-রাসুলগণের সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নবিদের সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার। তার মধ্যে ৩১৩ বা অন্য বর্ণনায় ৩১৫ জন রাসুল'। (তাবারানি)

আল-কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম এসেছে । তবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির নিকট নবি পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَ إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○

অর্থ: 'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।' (সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ২৪)

তাঁদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যকের নাম কুরআন ও হাদিসে এসেছে। আর অধিকাংশের নাম আসেনি। এ বিষয়ে কুরআন মাজিদে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আমি তো আপনার পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাঁদের কারও কারও কথা আপনার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা আপনার নিকট বিবৃত করিনি।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৭৮)

নবি-রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অংশ। দুনিয়াতে যারা নবি-রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করবে, ইহকাল ও পরকালে তারা সফলকাম হবে।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

যেসব বিশ্বাস ও কাজের মাধ্যমে রাসুলগণের প্রতি আমার ইমান দৃঢ় করবো

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তুমি বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে পূরণ করো।)

ক্রমিক	বিশ্বাসসমূহ	কাজসমূহ
১.	সকল নবি-রাসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।	নবি-রাসুলগণ ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের অনুসরণ করে আমিও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবো।

খতমে নবুওয়াত

খাতামুন অর্থ শেষ বা সমাপ্ত। আর নবুওয়াত অর্থ পয়গম্বারি, নবিগণের দায়িত্ব ইত্যাদি। সুতরাং খতমে নবুওয়াতের অর্থ নবুওয়াতের সমাপ্তি। খাতামুন শব্দের অন্যতম অর্থ সিলমোহর। সিলমোহর লাগানোর পর তাতে কিছু প্রবেশ করানো যায় না। নবুওয়াতের সিলমোহর হলো নবুওয়াতের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা। নবুওয়াত তথা নবি-রাসুল আগমনের এ ক্রমধারার সমাপ্তিকেই খতমে নবুওয়াত বলা হয়। আর যার মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল।

রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবি ও রাসুল

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। দুনিয়াতে আগমনকারী সব নবি-রাসুলই কোনো বিশেষ গোত্র, বিশেষ দেশ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সারা বিশ্বের সকল মানুষের নবি। নবি আগমনের ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে। আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। সুতরাং তিনিই সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি। কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না।

খতমে নবুওয়াতের প্রমাণ

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে খাতামুন নাবিয়্যিন হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। এতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারবে না। তাঁর পরবর্তী সময়ে যারা নবুওয়াত দাবি করেছে তারা সবাই ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। কুরআন মাজিদ ও হাদিসে খতমে নবুওয়াতের অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। এর মধ্যে কতিপয় প্রমাণ নিম্নরূপ:

আল-কুরআনের দলিল

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মহানবি (সা.)-কে খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

অর্থ: 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবি।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০)

হাদিসের দলিল

খতমে নবুওয়াত প্রমাণে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মহানবি (সা.) বলেন—

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيُ

অর্থ: 'আমিই শেষ নবি। আমার পরে আর কোনো নবি নেই।' (তিরমিযি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রিসালাত ও নবুওয়াতের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি ও রাসুল আসবে না'। (তিরমিযি)

নবি কারিম (সা.) আরো বলেন, 'বনি ইসরাইলে নবিগণই নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোনো নবি ইন্তেকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবি আসবে না।' (বুখারি)

অন্য এক হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবি হওয়ার দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না'। (আবু দাউদ)

অন্য একটি হাদিসে মহানবি (সা.) উপমার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবিগণের দৃষ্টান্ত হলো এমন যে, এক লোক একটি দালান নির্মাণ করল। খুব সুন্দর ও লোভনীয় করে তা সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান ফাঁকা ছিল। লোকজন দালানটির চারদিকে ঘুরে এর সৌন্দর্য দেখছিল আর বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল- 'এ কোণে একটি ইট রাখা হয়নি কেন? বস্তুত আমিই সে ইট এবং আমিই শেষ নবি।' (বুখারি)

উপমার মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, মহানবি (সা.) হলেন নবুওয়াতের দালানের সর্বশেষ ইট। তাঁর মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হয়ে গেল নির্মাণকাজ। ফলে নতুন করে দালানে আর ইট লাগানোর প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবি ও রাসুল।

যৌক্তিক প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সকল কিছুরই শুরু এবং শেষ আছে। তাই নবুওয়াতেরও শুরু এবং শেষ আছে। এক নবির পর অন্য নবি আসার কতগুলো যৌক্তিক কারণ থাকে। যেমন—

১. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা যদি কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়।

২. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষায় যদি নতুন কিছু সংযোজন-বিয়োজন প্রয়োজন হয়।

৩. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা যদি বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে যায়।

মহানবি (সা.)- এর নবুওয়াতের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কারণগুলোর কোনোটিই প্রযোজ্য নয়। কেননা, মহানবি (সা.) কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সময়ের জন্য আসেননি। বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের নবি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا

অর্থ: আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (সূরা সাবা, আয়াত: ২৮)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে দ্বীন (ইসলাম) পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। এতে কোনোরূপ সংযোজন-বিয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

অর্থ: 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি এবং রাসুল। তাঁর পরে আর কোনো নবি-রাসুল আসবেন না এবং আসার কোনো প্রয়োজনও নেই। তারপরে যদি কেউ নবুওয়াতের দাবি করে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড ও প্রতারক।

আমরা খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস করবো। এতে বিশ্বাস করা ইমানের অপরিহার্য অংশ। আমরা আমাদের জীবনের সর্বাবস্থায় মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে চলবো।

জোড়ায়/দলগত কাজ ও উপস্থাপন

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জোড়ায় আলোচনা করে উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে আল-কুরআন ও হাদিসের বাণীসমূহ ছোট কাগজে অর্থসহ লিখ।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবি।

ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমন

হযরত ঈসা (আ.)-এর দুনিয়াতে পুনরাগমন ও ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমনে বিশ্বাস ইসলামি আকিদার একটি দিক। কিয়ামতের ১০টি বড় আলামতের অন্যতম হলো ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমন।

আখেরি যামানায় ইমাম মাহদি (আ.)- এর আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের সর্বপ্রথম বড় আলামত। ইমাম মাহদি (আ.) এবং ঈসা (আ.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আনীত দ্বীন ইসলামের অনুসারী হবেন।

ইমাম মাহদির পরিচয়

ইমাম মাহদির প্রকৃত নাম হবে মুহাম্মাদ এবং পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর হবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মাহদি আসবেন আমার বংশধর হতে। তাঁর কপাল হবে উজ্জ্বল এবং নাক হবে উন্নত। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন, যেভাবে পৃথিবী যুলুম-নির্যাতনে পূর্ণ হয়েছিল।' (আবু দাউদ)

ইমাম মাহদি (আ.)-এর আগমন

কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবী যখন যুলুম-নির্যাতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্নীতি, হিংসা ও হানাহানিতে ভরে যাবে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে চলে যাবে, তখন শুধু মুসলমানরাই নয়, বিশ্বের সকল নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত জাতি একজন ত্রাণকর্তার আগমন কামনা করবেন। যিনি তাদেরকে অন্যায়-অবিচারের অন্ধকার থেকে মহামুক্তির আলোর দিকে পথ দেখাবেন। তখন উম্মতে মুহাম্মাদির মাঝে একজন ব্যক্তি আগমন করবেন। তিনি রমযান মাসে কাবা ঘর তাওয়াফ অবস্থায় প্রকাশ পাবেন। কাবা চত্বরে মুসলমানগণ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে বছর রমযান মাসের প্রথম দিকে সূর্যগ্রহণ এবং রমযান মাসের শেষের দিকে চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা ঘটবে, সেই বছরই ইমাম মাহদি'র আবির্ভাব হবে'। তিনি শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর উম্মাত হিসেবে এ দুনিয়াতে আসবেন। তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদির নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। ইসলাম ধর্মকে সংস্কার করবেন। ইসলামি শরিয়তের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করবেন। পৃথিবী হতে যুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন।

ঈসা (আ.)- এর আগমন

ইমাম মাহদি (আ.)- এর আবির্ভাবের সাত বছরের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। দাজ্জাল ও তার বাহিনী মুসলমানদের উপরে অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন করতে থাকবে। একদিন দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে ঈসা (আ.) দামেস্কের একটি মসজিদে অবতরণ করবেন। তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদি হিসেবে দুনিয়াতে আসবেন। নেমে এসে তিনি ইমাম মাহদি (আ.)- এর সাথে মুসাফাহা করবেন। এরপর ইমাম মাহদির পিছনে মুক্তাদি হয়ে আসরের সালাত আদায় করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সেদিন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ.) অবতরণ করবেন এবং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন তোমাদের ইমাম হবেন।' (বুখারি)

আখিরাতের প্রতি ইমান

প্রিয় শিক্ষার্থী, ষষ্ঠ শ্রেণিতে তুমি আখিরাত জীবনের বিভিন্ন স্তর এবং ইমানের সাতটি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে জেনেছো। সপ্তম শ্রেণিতে ইমানের সাতটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ইমান, ফিরিশতাগণের প্রতি ইমান, কিতাবসমূহের প্রতি ইমান-সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছো। এরই ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে তুমি আখিরাত জীবনের অংশ হিসেবে কিয়ামত, পুনরুত্থান ও হাশর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এছাড়াও এ অধ্যায়ে তাকদিরের ওপর ইমান, শাফা‘আত এবং শিরক সম্পর্কে জানতে পারবে।

জোড়ায় কাজ

কিয়ামত দিবসের তাৎপর্য এবং আমার বিশ্বাস
উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা প্যানেল/জোড়ায় আলোচনা করো।

কিয়ামত

ইসলামি আকিদা মোতাবেক কিয়ামত বলতে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান অতঃপর হাশরের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া বুঝায়। নিম্নে এ বিষয়গুলো নিয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো:

(ক) মহাপ্রলয়

কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে মহান আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন। তিনি ছাড়া কেউ তা জানেন না। যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় চলে আসবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) কর্তৃক শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার মাধ্যমে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ঘটবে। এ মহাপ্রলয়ের দৃশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মানুষ ভয়ে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো ছুটাছুটি করতে থাকবে। তারা তাদের পরিবারের লোকদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা ফিরে যাবার অবকাশ পাবে না। বন্য পশুরা ভয়ে একত্রিত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়।’ (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ১-২)

সেদিন পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে। আসমান ও জমিনে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। পর্বতমালা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে এবং রঙিন পশমের মতো উড়তে থাকবে। সমুদ্রে আগুন জ্বলে ওঠবে। আকাশের আবরণ অপসারিত হয়ে গলিত তামার ন্যায়

হবে। সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। নক্ষত্ররাজি বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়বে। চন্দ্র ও সূর্য একত্রিত হয়ে যাবে। সেদিন আকাশসমূহকে এমনভাবে গুটিয়ে নেওয়া হবে যেভাবে পুস্তকে লিখিত কাগজপত্র গুটিয়ে রাখা হয়। এভাবে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের প্রথম পর্ব সংঘটিত হবে। এ মহাপ্রলয়ে বিশ্বাস করা ইমানের অংশ।

(খ) পুনরুত্থান

পুনরুত্থান অর্থ পুনরায় উত্থান, কবর হতে মৃতের উত্থান। মহান আল্লাহ মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ তথা পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু দান করেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ২৬)

শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর পুনরুত্থান ও হাশর বা মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিনই বিচারের দিন। আখিরাত বা পরকালের অনন্ত জীবনের সূচনা এদিন থেকেই হবে। আল-কুরআনে এ দিনকে 'ইয়াওমুল বা'ছ' বা পুনরুত্থান দিবস, হিসাব গ্রহণের দিবস, প্রতিদান দিবস ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যারা এই পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিও বিশ্বাস রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।' (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৭)

বাড়ির কাজ

'কিয়ামত সম্পর্কে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের ধারণা'

(প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি তোমার প্রতিফলন ডায়েরিতে উপরোক্ত শিরোনামের আলোকে ছকটি পূরণ করবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের সদস্য/প্রতিবেশি/সহাপাঠীর ধারণা জানতে পারো।)

ক্রমিক	পরিবারের সদস্য	বিশ্বাস	সঠিক/ভুল
১.	বড় ভাই	ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামত শুরু হবে।	সঠিক
২.			
৩.			
৪.			

(গ) হাশর

হাশর অর্থ একত্রিত হওয়া। মহান আল্লাহর হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙ্গায় ফুঁৎকারের মাধ্যমে সবাই পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এ দিন সবাই নিজ নিজ কর্মফলপ্রাপ্ত হবে। তাই এটি 'ইয়াউমুদ্দিন' বা কর্মফল দিবস।

পৃথিবীই হবে হাশরের মাঠ। কিয়ামতের দিন পৃথিবী পরিণত হবে একটা উদ্ভিদশূন্য মসৃণ সমতল প্রান্তরে। মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে। হাশরের দিনের দৈর্ঘ্য হবে আমাদের গণনায় পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

আর এ দিনটিই হবে কবর থেকে জীবিত হয়ে ওঠার দিন। প্রত্যেক মানুষ ভীত-শঙ্কিত চোখে তাদের কবর থেকে বের হয়ে আসবে। তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে জাগিয়ে তুলল। তারা আহবানকারীর দিকে দৌঁড়াতে থাকবে। তাদেরকে মনে হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। কাফিররা বলবে, এটা তো কঠিন দিন। সহসাই সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হয়ে যাবে। মানুষ মনে করবে তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।

সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অন্যের দিকে তাকানোর মতো হুঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। সেদিন পিতা তার সন্তানের কোনো উপকার করতে পারবে না। সন্তানও পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন, তিনি ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। মানুষ তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি থেকে পালিয়ে থাকবে।

মহান আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করবেন। জিবরাইল (আ.) সহ ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকবেন। পরম করুণাময়ের সামনে সকল আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে। এক ক্ষীণ অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাওয়া যাবে না। সকলেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তার সামনে অবনত হবে। জমিন তার রবের জ্যোতিতে ঝলমল করে উঠবে। নবিগণ ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে। আমলনামা পেশ করা হবে। অপরাধীরা তাদের আমলনামা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। তারা বলবে, 'হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ যায়নি। এতে তো সব কিছুই রয়েছে।' প্রত্যেক মানুষ তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। জান্নাতকে নিকটে আনা হবে। জাহান্নামকে উন্মুক্ত করা হবে। সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে; কিন্তু এ উপলব্ধি তার কোনো কাজে আসবে না। সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু আগে পাঠাতাম! অর্থাৎ দুনিয়াতে নেক আমল করতাম। হায় আফসোস! আমাকে যদি আর একবার পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।' সেদিন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিন, আমরা ভালো কাজ করব, আমরা এখন দৃঢ় বিশ্বাসী।

সেদিন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে নূর ছুটতে থাকবে। মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলো থেকে কিছুটা নিতে পারি। বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান করো।' অতঃপর উভয়ের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হবে যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভিতর ভাগে থাকবে রহমত আর বাহিরে সর্বত্র থাকবে আযাব।

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা সহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি তার আমলনামা ডানহাতে পাবে সে বলবে, 'এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' অতপর তার হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে। সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে।

মুত্তাকিদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তাঁরা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখি হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো।'

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি ধূসরিত ও বিবর্ণ হবে। পাপের কালিমা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফির ও পাপাচারী। তারা তাদের আমলনামা বাম হাতে পাবে। আর যার আমালনামা বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, 'হায় আফসোস! আমাকে যদি আমার আমালনামা না দেওয়া হতো। আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আমার ধন-সম্পদ, আমার ক্ষমতা কোনো কাজেই এলো না।' আর যাকে তার আমালনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে। সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে। আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। অপরাধীরা সেদিন নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে যাবে। তাদের মাথার চুল ও পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া হবে।

কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে-এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানে থাকতে হবে। কতই না নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল।

দলগত আলোচনা

পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তি এবং আযাব থেকে দূরে থাকার জন্য করণীয়

উল্লিখিত শিরোনামে বাস্তব জীবনে তুমি/তোমরা কী কী কাজ করবে এবং কী কী কাজ থেকে দূরে থাকবে, দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করো।

যে যে কাজ করবো	যে যে কাজ করবো না
মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করবো।	আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করবো না।

তাকদিরের প্রতি ইমান

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা হয়তো তাকদির সম্পর্কে পূর্বে থেকেই জানো। তাকদির সম্পর্কে পাঠ্য বইয়ের মূল আলোচনা শুরুর আগে চলো আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামের আলোকে জোড়ায় আলোচনায় অংশ নেই।

জোড়ায় আলোচনা

তাকদিরে বিশ্বাসের ফলে তোমাদের জীবনে কী কী পরিবর্তন হতে পারে বলে তোমরা মনে করো।

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে জোড়ায় বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

১. মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বেড়ে যাবে।

২. ....

৩. ....

৪. ....

তাকদির আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারণ করা, নির্দিষ্ট করা, ধার্য করা, নিয়তি, ভাগ্য ইত্যাদি। এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সেসব নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে তাকদিরসহ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর কোথায়, কোন সময় কী ঘটবে এবং কীভাবে ঘটবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তা পূর্ব নির্ধারিত। পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষের উপর যত বিপদ আসে তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে (তাকদিরে) লিপিবদ্ধ আছে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। অতএব কোনো কিছু হারিয়ে গেলে আফসোস করা যাবে না। আবার ভালো কিছু পাওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হওয়া যাবে না। সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কারণ ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়। তাকদিরের বাইরে কোনো কিছুই নেই। সবকিছুই তাকদির অনুযায়ী সংঘটিত হয়, এমনকি অক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তাও।

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃত মুমিন হতে হলে অবশ্যই তাকদির বিশ্বাস করতে হবে। তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক।

তাকদিরের প্রকারভেদ

তাকদির দুই প্রকার। যথা:

১. তাকদিরে মুবরাম অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় তাকদির ও

২. তাকদিরে মুআল্লাক অর্থাৎ পরিবর্তনযোগ্য তাকদির।

তাকদিরে মুবরাম কখনোই পরিবর্তিত হয় না। আর তাকদিরে মুআল্লাক বান্দার নেক আমল, দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দোয়া ভাগ্যকে পরিবর্তন করাতে পারে। আর নেক আমল বয়সকে বৃদ্ধি করাতে পারে।' (তিরমিযি)

তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে বলেই মানুষ ভালো-মন্দ ইত্যাদি কাজ করছে বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তা'আলা আলিমুল গায়েব। আমরা কখন কী করব, কী খাব, কোথায় কী ঘটবে-এগুলো আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। ফলে তিনি তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অনেকে প্রশ্ন করেন মানুষ ভালো-মন্দ যত কাজ করে তা আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদিরে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে করে। তাহলে মানুষের কী দোষ? কেন আল্লাহ মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দিবেন? আসলে মহান আল্লাহ মানুষকে ভালো এবং মন্দ দুটি সুস্পষ্ট পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যুলুম করেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى
كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۝

অর্থ: 'আর আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুযায়ী ফল দেওয়া যেতে পারে। আর তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।' (সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ২২)

আল্লাহ মানুষকে কর্মনির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে মানুষ চেষ্টা ছাড়া কোনো কিছুই পেতে পারে না। তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন আর ভালো ও মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দান করেছেন। ভালো এবং মন্দ কাজ মানুষ স্ব-জ্ঞানে ও নিজ ইচ্ছায় করে থাকে। মহান আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় কাউকে ভালো বা মন্দ কাজ করার জন্য বাধ্য করেন না। যদি তিনি এরূপ করতেন তাহলে দুনিয়ার সকল মানুষ ইমানদার হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ
اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۝

অর্থ: আর আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ইমান আনতো। তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন?' (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯)

যে ব্যক্তি আল্লাহর দেখানো উত্তম পথে চেষ্টা সাধনা করে আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন। আর যে নিজেকে পথভ্রষ্ট করে তার জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। অতএব নিজেদের খারাপ কাজগুলো আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদিরে লেখার কারণে হয়েছে এ ধরনের কথা বলে খারাপ কর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাকদিরের দোহাই দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি বা জান্নাত লাভ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ছোট একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়। উমর (রা.)- এর খেলাফত আমলে এক লোক চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হলো এবং আদালতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলো। শাস্তি হিসেবে তার হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হলো। লোকটি উমর (রা.)- এর কাছে গিয়ে বলল, 'মুসলিম জাহানের হে মহান খলিফা! আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। আমিও তো আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নই। আমি তাঁর ইচ্ছায়ই চুরি করেছি। আমার হাত কাটা যাবে কেন?' উমর (রা.) বললেন, 'সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় বা তাকদিরের কারণে হয়। তুমি যেমন আল্লাহর ইচ্ছায় চুরি করেছ, তেমনি তোমার হাত আল্লাহর ইচ্ছায়ই কাটা হবে।'

শাফা'আত (اَلشَّفَاعَةُ)

শাফা'আত আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ কোনো কিছু জোড় সংখ্যক হওয়া, কারও জন্য সুপারিশ করা, অনুরোধ করা, মধ্যস্থতা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় শেষ বিচারের দিন ক্ষমা ও কল্যাণ লাভের জন্য মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবি-রাসুলগণ, ফেরেশতাগণ ও পুণ্যবান বান্দাগণ কর্তৃক মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করাকে শাফা'আত বলে।

জোড়ায় আলোচনা

পরকালে শাফা'আত লাভের জন্য ব্যক্তি, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ জীবনে আমি যেসব ভাল কাজ করবো এবং যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে জোড়ায় আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

ক্ষেত্রসমূহ	যেসব ভালো কাজ করবো	যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো
ব্যক্তিগত জীবনে	কুরআন তিলাওয়াত	রোযা ভঙ্গ করবো না
পরিবারে		
বিদ্যালয়ে		
সমাজে		

শাফা'আতের তাৎপর্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকলের কৃতকর্মের হিসাব নিবেন। তখন আমল অনুযায়ী পুণ্যবানদের জন্য জান্নাত আর পাপীদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হবে। মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবি-রাসুলগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণ আল্লাহর কাছে পাপীদের পাপ মার্জনার জন্য শাফা'আত করবেন। তখন পাপীরা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে জান্নাতে যাবার সৌভাগ্য লাভ করবে। আর পুণ্যবানদের জন্য শাফা'আত করার কারণে জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

হাশরের ময়দানের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। সকল মানুষ খুবই পিপাসার্ত হবে এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবে। তারা নিজেদের পরিণতি নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকবে। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ নবি-রাসুলগণ ও পুণ্যবান বান্দাগণকে শাফা'আত করার বিশেষ অনুমতি দিবেন।

কুরআন ও হাদিসে শাফা'আত

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফা'আত করার অনুমতি পাবেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। পবিত্র কুরআনে শাফা'আত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۘ

অর্থ: 'যে পরম দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করবার ক্ষমতা থাকবে না।' (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৭)

তিনি অন্যত্র আরো বলেছেন,

وَ لَا تَنۡفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا لِمَنۡ اَذِنَ لَهٗ ؕ

অর্থ: 'যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবা, আয়াত: ২৩)

এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে কাফির-মুশরিকদের জন্য কিয়ামতের দিন কোনো শাফা'আত থাকবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কিয়ামতের ময়দানে অসহায় হয়ে পড়বে।

মহানবি (সা.)- এর হাদিসেও শাফা'আতের কথা এসেছে। তিনি বলেছেন, 'পৃথিবীতে যত ইট পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি মানুষের জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আত করবো।' (মুসনাদে আহমদ)

আরেকটি হাদিসে তিনি বলেছেন,

أُعۡطِيۡتُ الشَّفَاعَةَ

অর্থ: 'আমাকে শাফা'আত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।' (বুখারি ও মুসলিম)

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বাণীর আলোকে এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, কিয়ামতের দিন চরম ভয়াবহ মুহূর্তে নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলিম, হাফিজে কুরআন ও পুণ্যবান বান্দাগণ মহান আল্লাহর দরবারে শাফা'আত করার অনুমতি লাভ করবেন। আল্লাহ তা'আলা এসব শাফা'আত কবুল করবেন এবং অসংখ্য মানুষকে জান্নাত দিবেন। তবে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সবচেয়ে বৃহৎ পরিসরে শাফা'আত করার অধিকার দেওয়া হবে।

শাফা'আত-এর বিভিন্ন পর্যায়

শাফা'আত সম্পর্কিত হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করলে আমরা শাফা'আত-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কথা জানতে পারি। যথা-

ক. কিয়ামতের দিন সবাই যখন হিসাবের জন্য হাশরের ময়দানে একত্রিত হবেন, তখন এক অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে। সূর্য থাকবে খুবই নিকটে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় মানুষের কষ্টের সীমা থাকবে না। এ অবস্থায় মানুষ পর্যায়ক্রমে আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে এসে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে শাফা'আত করতে অনুরোধ করবে। কিন্তু তাঁরা সবাই অপারগতা প্রকাশ করবেন। সবশেষে তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর কাছে আসবে। তখন তিনি মহান আল্লাহর কাছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য শাফা'আত করবেন। একে বলা হয় শাফা'আতে কুবরা।

খ. হিসাব-নিকাশের পর যেসব মুমিন জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে, তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের জন্য মহানবি (সা.) মহান আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবেন। তাঁর জন্যই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে।

গ. বিনা হিসাবে জান্নাত দানের শাফা'আত। এ শাফা'আতে উম্মতে মুহাম্মাদির বিপুল সংখ্যক লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ শাফা'আতও কেবল মহানবি (সা.)- এর জন্য নির্দিষ্ট।

ঘ. যেসব মুমিন পাপের জন্য জাহান্নামের উপযুক্ত হবে, তাদের ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য মহানবি (সা.) শাফা'আত করবেন।

ঙ. যেসব মুমিন পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তিদানের জন্য মহানবি (সা.) শাফা'আত করবেন।

চ. যেসব মুমিন জান্নাতবাসী হয়েছেন, জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফা'আত। এ শাফা'আত অন্যান্য নবি-রাসুল ও আউলিয়ায়ে কেরামও করবেন।

ছ. একদল মানুষ পাপ-পুণ্য সমান হওয়ায় আ'রাফে অবস্থান করবে। আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি উঁচু স্থান। মহানবি (সা.) তাঁদের জন্যও শাফা'আত করবেন। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন।

জ. কিয়ামতের দিন আল-কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য এবং সাওম পালনকারীদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবে বলে হাদিসে উল্লেখ আছে।

শাফা'আত মহান আল্লাহর দেওয়া একটি বিশেষ নিয়ামত। আমরা প্রিয় নবি (সা.)-এর শাফা'আতে বিশ্বাস করবো। তাঁকে ভালোবাসবো এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়বো। তাহলে আমরা পরকালে মহানবি (সা.)- এর শাফা'আত লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। কারণ তাঁর শাফা'আত ছাড়া আমাদের পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হবে না।

শিরক (اَلشِّرْكُ)

শিরকের পরিচয়

শিরক (اَلشِّرْكُ) শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, সহযোগী বানানো, সমকক্ষ বা সমতুল্য করা। ইসলামি পরিভাষায় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ বা সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে। যে শিরক করে তাকে মুশরিক বলে। আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য কেউ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকতো, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত'। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২) পবিত্র কুরআনের এ আয়াত আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শিরকের ধারণা খণ্ডন করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝

অর্থ: 'বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।' (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১)

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক ৩ প্রকার–

১. **আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা**

যেমন, আল্লাহ তা'আলার পিতা, স্ত্রী এবং সন্তান আছে এই বিশ্বাস করা। এ ধরনের শিরক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই'। (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ৩-৪)

২. **ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করা**

ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন, সালাত, সাওম, পশু কুরবানি ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বা উদ্দেশ্যে করা। এ ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থ: 'বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২)

৩. **আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলিতে শিরক**

আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলিতে কোনো সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি, জীবিকা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক মনে করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কি কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে?' (সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ৩)

একক কাজ

শিরক হয়/হতে পারে এমন কাজগুলোর তালিকা তৈরি করো।

১। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদাতের মালিক মনে করা।

২। ....

৩। ....

৪। ....

শিরকের পরিণাম ও প্রতিকার

আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে শিরক। এর পরিণাম ভয়াবহ। পৃথিবীতে যত প্রকার যুলুম আছে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ বা যুলুম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।' (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩)

সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। তাই মানুষ কোনোভাবেই আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত পেয়েও যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না এবং এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই মহান আল্লাহর জন্য সকল ইবাদাত ও আমল হবে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত। শিরক মিশ্রিত যে কোনো আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি আল্লাহর শরিক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা যুমার, আয়াত: ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তাঁর দয়া, রহমত ও ক্ষমা ব্যতীত দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি সম্ভব নয়। পরকালে মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী আবাসস্থল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৭২)

এ প্রসঙ্গে নবি করিম (সা.) বলেন, 'জিবরাইল (আ.) আমার নিকট এসে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ শিরক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। (মুসলিম)

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বারবার শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ শিরক হলো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তাই সকলের কর্তব্য হলো সর্বদা শিরক থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকা। কোনোভাবে শিরক হয়ে গেলে পুনরায় বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে ইমানের দিকে ফিরে আসা। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের পাপ না করার অঙ্গীকার করা।

আমরা শিরক থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট থাকবো এবং এ বিষয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবো।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

দৈনন্দিন জীবনে শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য আমি যেসব ভালো কাজ করবো এবং যেসব মন্দ কাজ বর্জন করবো।

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শ্রেণিতে পূরণ করবে।)

ক্রমিক	করণীয়	বর্জনীয়
১		
২		
৩		
৪		
৫		

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই অধ্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে তোমরা ইসলামের মৌলিক আকিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছো। তুমি এখন সহজেই অনুমান করতে পারবে তোমার চারপাশের সমাজে এমন কিছু বিশ্বাস ও কাজ হচ্ছে যা ইসলামসম্মত নয়। একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে তোমাকে এ ধরনের বিশ্বাস ও কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত থাকতে হবে। চলো, মুসলিম সমাজে ইসলামি আকিদা পরিপন্থী প্রচলিত বিশ্বাস ও কাজগুলো চিহ্নিত করি। এই কাজে শিক্ষক ও অন্য বন্ধুদের সহায়তা নাও। প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য বা ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন গুরুজনদের মতামত নাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

পৃথিবীর সকল মাখলুককে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনে এসেছে, 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে'। (সূরা আয- যারিয়াত, আয়াত: ৫৬) ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরিয়ত সমর্থিত যে কোনো উত্তম কাজই ইবাদাত।

ইবাদাত অর্থ আনুগত্য করা, বিনয় প্রকাশ করা, নমনীয় হওয়া, দাসত্ব করা। ইসলামি পরিভাষায় জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদাত বলে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা ইবাদাতের পরিচয়, তাৎপর্য ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনেছ। ইসলামের প্রধান কয়েকটি ইবাদাত সালাত (নামায), সাওম (রোযা) ও যাকাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছো। এখানে আমরা ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহের মধ্যে সালাত (নামায), সাওম (রোযা), যাকাত ও হজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ইবাদাত অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছো। এখন নিশ্চয়ই বাস্তব জীবনে সেগুলো অনুশীলন ও চর্চা করো। ৮ম শ্রেণির এই অধ্যায় থেকে তুমি চারটি ইবাদাত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ধারণা অর্জন করবে। এভাবে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী ইবাদাতগুলো নিজে অনুশীলন ও চর্চা করার মাধ্যমে ইবাদাতের মূল শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারবে।

এই অধ্যায়ের পাঠের আলোচনা শুরুর পূর্বেই একটু মনে করার চেষ্টা করো, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ইবাদাত অধ্যায়ে তুমি কী কী পড়েছিলে বা শিখেছিলে? এই ব্যাপারে তোমার সহপাঠী বন্ধুদের সহায়তা নাও, প্রয়োজনে

শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তা নাও। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। তাহলে চলো, আমরা এই ইবাদাত সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করি।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'আমি সপ্তম শ্রেণিতে জেনে যেসব সালাত নিয়মিত চর্চা করি'

(প্রিয় শিক্ষার্থী, উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তুমি শ্রেণিতে পূরণ করবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার সহপাঠী বা শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো। পূরণকৃত ছকটি মা-বাবা/অভিভাবকের মতামতসহ পরিবর্তী সেশনে জমা দিবে।)

ক্রমিক	সপ্তম শ্রেণিতে জেনে আমি যেসব সালাত নিয়মিত চর্চা করি	সালাতের রাকাআত সংখ্যা/ বিশেষ নিয়ম	অভিভাবকের মন্তব্য/স্বাক্ষর
১.	সালাতুল বিতর।	তিন রাকাআত, তৃতীয় রাকাআতে দোয়া কুনুত পড়তে হয়।	নিয়মিত পড়েছে।
২.			
৩.			
৪.			

ইমান গ্রহণের পর মুমিনের প্রথম পালনীয় ইবাদাত হচ্ছে সালাত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মাঝে সালাত একমাত্র ফরয ইবাদাত যা আমরা প্রতিদিন আদায় করি। সালাত সর্বোত্তম ইবাদাত। বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নিবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগকারী ফাসিক বা পাপাচারী হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই আমরা নিয়মিত সালাত আদায় করবো। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ছাড়াও রাসুলুল্লাহ (সা.) দিনের বিভিন্ন সময়ে নফল সালাত আদায় করতেন। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ফরয সালাতসহ অন্যান্য সালাত আদায় করা শিখেছি। সেগুলো অনুশীলন করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন নফল সালাত যেমন, সালাতুল আওয়াবিন, সালাতুত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি আদায় করা শিখবো ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবো।

নফল সালাত

নফল অর্থ অতিরিক্ত। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত ব্যতীত যত প্রকারের অতিরিক্ত সালাত আছে, সবই নফল সালাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছু সালাত মাঝে মাঝে আদায় করতেন আবার মাঝে মাঝে আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন, যাতে উম্মতের ওপর তা ওয়াজিব না হয়ে যায়। এমন সালাত সুন্নাতে যায়েদা বা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত। এগুলো আদায়ের সময় নির্দিষ্ট। যেমন সালাতুল ইশরাক্ব, সালাতুল আওয়াবিন, সালাতুত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) যে সালাত সর্বদা আদায় করেছেন ও সাহাবিদেরকে আদায় করতে তাগিদ দিয়েছেন তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেমন, ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাআত, যোহরের ফরযের পূর্বের চার রাকাআত ও পরের দুই রাকাআত সালাত ইত্যাদি।

এছাড়া নিষিদ্ধ ও মাকরুহ ওয়াক্ত ব্যতীত অতিরিক্ত যে কোনো সালাতকে আমরা মুস্তাহাব সালাত বলি। সুন্নাতে যায়েদা ও মুস্তাহাব সালাত নফল সালাতের অন্তর্ভুক্ত। নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যে কোনো সময় নফল সালাত আদায় করা যায়। নফল সালাত দুই বা চার রাকাআত করে আদায় করতে হয়। তবে দুই রাকাআত করে আদায় করা উত্তম। সুন্নাত সালাতের নিয়মে নফল সালাত আদায় করতে হয়।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

সালাত সংক্রান্ত শিক্ষকের বর্ণিত ঘটনা বা গল্পের শিক্ষা আমার নিজের জীবনে যেভাবে প্রয়োগ করতে চাই।

পরিবারের সদস্য/ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পাশাপাশি নফল সালাত আদায় করার নিয়ম জেনে নিবো। ....

নফল সালাতের গুরুত্ব

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হতে চায়, তার উচিত বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা। সালাত রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সবচেয়ে প্রিয় ইবাদাত। তিনি বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন। ফরয ও ওয়াজিব সালাত আদায় করলে অন্তরে যে নূর তৈরি হয়, নফলের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পায়। অন্তরের প্রশান্তি আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ

অর্থ: 'নামাযেই আমার চোখের শীতলতা দান করা হয়েছে।' (নাসাঈ)

দলীয় আলোচনা

সালাতেই আমার চোখের শীতলতা দান করা হয়েছে

(উল্লিখিত হাদিসের মর্মবাণী শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দলে/প্যানেলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

নফল সালাত আদায়কারী আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সিজদা করা। আর সালাত আদায়কারী সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, 'আপনি সিজদা করুন ও নিকটবর্তী হন'। (সূরা আল আলাক, আয়াত: ১৯) হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তোমার উচিত বেশি বেশি সিজদা করা (অর্থাৎ সালাত আদায় করা)। তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন ও একটি গুনাহ মাফ করবেন।' (মুসলিম)

একদিন রাবিআহ ইবনু কাব আল আসলামি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জান্নাতে তাঁর সাহচর্যের জন্য আবেদন করেন। তখন তিনি তাকে বেশি বেশি সিজদা করার পরামর্শ দেন, যাতে তিনি জান্নাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হতে পারেন। (মুসলিম)

তাই আমরা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত আদায় করার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য নিয়মিতভাবে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবো। যোহর সালাতের পর দুই রাকাআত নফল, আসর সালাতের পূর্বে চার রাকাআত, মাগরিবের সালাতের পর দুই রাকাআত, এশার সালাতের পূর্বে চার রাকাআত সালাত আদায়ের অভ্যাস করবো। আমরা ফরয সালাত আদায়ে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে ফেলি। নফল সালাত ফরযের ঘাটতি পূরণ করে। ইবাদাতে ইখলাস বৃদ্ধি করে। আমরা নির্জনে নফল সালাত আদায়ের চেষ্টা করবো, যাতে আমাদের সালাত লৌকিকতামুক্ত থাকে।

বাড়ির কাজ

'এখন থেকে আমি ফরয সালাতের পাশাপাশি আর যেসব সালাত আদায় করতে পারবো'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তুমি তোমার পরিবারের সদস্য/সহপাঠীর সহায়তায় পূরণ করো।)

সালাতুল আওয়াবিন (صَلٰوةُ الْأَوَّابِيْنَ)

আওয়াবিন অর্থ নেককার ও অধিক তাওবাকারী বান্দাগণ। সালাতুল আওয়াবিনের আভিধানিক অর্থ নেককার ও অধিক তাওবাকারী বান্দাগণের নামায। মাগরিবের সালাত আদায়ের পর এশার সালাতের পূর্বে যে সালাত

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আদায় করা হয়, তাই সালাতুল আওয়াবিন। এ সালাত আদায় করা সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা। অর্থাৎ যে সুন্নাতের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকলেও আদায় করলে সাওয়াব পাওয়া যায়।

সালাতুল আওয়াবিন আদায়ের নিয়ম ও ফযিলত

মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত সালাত আদায়ের পর দুই রাকাআত করে সুন্নাত সালাত আদায়ের নিয়মে ছয় রাকাআত সালাত আদায় করতে হয়। রাসুল (সা.) এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিদেরকে আদায়ের উৎসাহ দিয়েছেন। সালাতুল আওয়াবিনের ফযিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাআত সালাত আদায় করে, মাঝখানে কোনো মন্দ কথা না বলে, তাহলে সে বারো বছরের নফল ইবাদাতের সমান সাওয়াব পাবে'। (তিরমিযি)

যেহেতু এ সালাত সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা, তাই ছয় রাকাআতের কম বা বেশি আদায় করা যায়। রাসুল (সা.) অনেক সময় মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত সালাত আদায় করেছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, 'হযরত হুজায়ফা (রা.) নবি করিম (সা.)-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের সালাত আদায় করে এশার সালাতের পূর্ব পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন'। (সহিহ ইবনে খুজায়মা)

আমরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য সালাতুল আওয়াবিন আদায়ের অভ্যাস করবো। প্রতিদিন আদায় করতে না পারলেও বিশেষ দিনগুলিতে যেমন জুমার রাত, রমযান মাস বা ছুটির দিনে আমরা সালাতুল আওয়াবিন আদায় করবো।

সালাতুত তাহাজ্জুদ (صَلٰوةُ التَّهَجُّدِ)

তাহাজ্জুদ আরবি শব্দ। এর অর্থ ঘুম থেকে জাগা, রাত জাগা, রাত জেগে ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য সালাতুল এশা আদায় করার পর শেষ রাতে যে সালাত আদায় করা হয়, তাই সালাতুত তাহাজ্জুদ। রাতের শেষভাগে বা দুই-তৃতীয়াংশে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করা উত্তম। রাসুল (সা.)-এর জন্য তাহাজ্জুদ সালাত আদায় আবশ্যক ছিল। কোনো কারণে রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে না পারলে, পরের দিন যোহর সালাতের আগেই তা কাজা আদায় করে নিতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার কারণে তাঁর পা ফুলে যেত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রিয় নবিকে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার জন্য তাগিদ দিয়ে কুরআন মাজিদে বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ○

অর্থ: 'আর আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করুন। এটি আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য।' (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯)

উম্মতের জন্য সালাতুত তাহাজ্জুদ ফরয বা আবশ্যিক করা হয়নি। তবে তিনি সাহাবিদেরকে এ সালাত আদায়

করার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তাই সাহাবিগণ এ সালাত নিয়মিত আদায় করতেন। তাহাজ্জুদ সালাত সর্বোত্তম নফল সালাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো তাহাজ্জুদ সালাত'। (মুসলিম)

সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়ম

সুন্নাত সালাতের নিয়মে দুই রাকাআত করে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করতে হয়। তাহাজ্জুদ সালাত সর্বনিম্ন দুই রাকাআত আদায় করা যায়। চার, আট বা বারো রাকাআত আদায় করা যায়। কেউ বেশি আদায় করতে চাইলে, তাও আদায় করতে পারবে। এশার সালাত আদায়ের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা যায়।

তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার পরে বিতর সালাত আদায় করতে হয়। যদি ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের অভ্যাস না থাকে, তাহলে এশার সালাতের পর বিতর সালাত আদায় করে নিতে হবে। বিতর সালাত আদায় করলেও ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই।

তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের এক অনন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাহাজ্জুদ সালাত। কারণ চারদিকে সবাই যখন আরামের ঘুমে মগ্ন, তখন নির্জনে কোনো বান্দা শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য সালাতে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

দিনে আমরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। আমরা চাইলেও অনেক সময় আমাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতি একান্তভাবে ধাবিত করতে পারি না। তাই রাতের সালাত আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করে। আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধ মানা সহজ হয়। আমাদের অন্তরের কুপ্রবৃত্তিও দমন হয়। ফলে তাহাজ্জুদ আদায়কারীর চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। অন্যায় কাজ থেকে আমরা সহজেই দূরে থাকতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন 'নিশ্চয়ই ইবাদাতের জন্য রাতে জাগ্রত হওয়া প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল'। (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ৬)

আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারীর দোয়া কবুল করেন ও গুনাহ মাফ করে দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, 'যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। যে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে, আমি তাকে তা দান করবো। যে আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দিব''। (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য আমরা নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবো। তাহাজ্জুদ আদায় করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি কয়েকবার দরুদ পাঠ করবো। তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের জন্য, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও সকল মানুষের জন্য দোয়া করবো।

তাহাজ্জুদ সালাত ছাড়াও আমরা যে কোনো সময় নফল সালাত আদায় করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা সালাত সম্পর্কে বলেন 'তোমরা আমার কাছে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো' (সূরা বাকারা, আয়াত:

১৫৩)। শুকরিয়া আদায় করতে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে, বিপদে-আপদে বা কোনো প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার নিকটে সাহায্য চাওয়ার জন্য আমরা নফল সালাত আদায় করবো।

একক কাজ
অনুশীলন

(প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা শিক্ষকের আলোচনার মাধ্যমে যে যে সালাতের নিয়ম জেনেছো, সেই সালাতসমূহ শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত স্থানে অনুশীলন করো।)

পাঠ্যপুস্তকে নিম্নে উল্লিখিত সালাতসমূহ নির্ধারিত সময়ে আদায় করে, নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করি

প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি নিম্নে উল্লিখিত ছক দুটি সঠিক তথ্য দিয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের মতামতসহ এক সপ্তাহ পর জমা দিবে।

ক্রমিক	সালাতের নাম	আদায় করার নিয়ম
১.	সালাতুল আওয়াবিন।	মাগরিবের নামাযের ফরয ও সুন্নাতের পর ছয় রাকাআত সালাত।

বার/তারিখ	যে যে নফল সালাতের আদায় করেছি	যে স্থানে আদায় করেছি	যে সময় আদায় করেছি	অভিভাবকের মন্তব্য
শনিবার	সালাতুল আওয়াবিন	মসজিদে	মাগরিবের সালাতের পর	
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				
শুক্রবার				

সাওম (اَلصَّوْمُ)

সাওম ইসলামের তৃতীয় রুকন। ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সবার ওপর রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। সাওমের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিবেন। পানাহার না করার কারণে রোযাদার ব্যক্তির মুখে যে গন্ধ তৈরি হয়, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধ থেকেও অধিক প্রিয়। রমযান মাস, সিয়াম পালন, তারাবিহর সালাত ও লাইলাতুল ক্বদর সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর উম্মতের জন্য বিশেষ উপহার।

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা সাওম পালন সম্পর্কে বেশ কিছু বিধি-বিধান শিখেছো। তারই ধারাবাহিকতায় এবার তোমরা সাওমের প্রস্তুতি, রমযান মাসের ফযিলত, লাইলাতুল ক্বদরের মাহাত্ম্য, ঈদ ও ঈদের দিন করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবে। তোমরা যথাযথভাবে সাওম পালন করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে পারবে ও সে অনুযায়ী মানবিক জীবন গঠন করতে পারবে। তাহলে চলো! এবার আমরা মূল আলোচনা শুরু করি।

প্রিয় শিক্ষার্থী, ইবাদাত অধ্যায়ের সাওম সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে তুমি/তোমরা বিগত রমযান মাসে যেসব ইবাদাত করেছ, তোমার বন্ধুর সাথে সেসব ইবাদাতের অভিজ্ঞতা বিনিময় করো। তুমি/তোমরা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে বিগত রমযান মাসের স্মৃতিচারণ করে যা যা পেলে, তা নিচের ছকে লিখে ফেলো।

জোড়ায় কাজ স্মৃতির পাতায় সাওম	
কার্যক্রমসমূহ	বিগত রমযান মাসে তুমি/তোমরা যা করেছ
বিগত রমযান মাসে যে ইবাদাত/আমল বেশি বেশি করেছি।	কুরআন তিলাওয়াত।
সাওমের যে কার্যক্রমটি বেশি ভালো লাগে।	
বিগত রমযান মাসের স্মরণীয় কোনো মুহূর্ত।	
সাওমের যে শিক্ষা/তাৎপর্য বাস্তব জীবনে চর্চা করি।	

সাওমের প্রস্তুতি

রমযান মুমিনের ইবাদাত ও আত্মশুদ্ধির মাস। দিনে সাওম পালন, সন্ধ্যায় ইফতার করা, রাতে তারাবিহর সালাত ও শেষ রাতে সাহরি খাওয়া। আমরা এভাবেই ইবাদাতে মশগুল হয়ে রমযান অতিবাহিত করি। সেজন্য আমাদের উচিত যথাযথ শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

রজব মাস থেকেই রাসুলুল্লাহ (সা.) সাওমের প্রস্তুতি শুরু করতেন। প্রিয় নবি করিম (সা.) রজব ও শাবান মাসের

বরকত লাভ ও রমযান পর্যন্ত হায়াত বৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতেন। তিনি বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! রজব মাস ও শাবান মাসে আমাদের বরকত দান করুন আর আমাদের রমযানে পৌঁছিয়ে দিন।' (মুসনাদে আহমাদ)

সারাদিন পানাহার না করে সাওম পালন করা কষ্টসাধ্য কাজ। তাই শাবান মাসে যথাসম্ভব নফল রোযা রেখে, রোযা রাখার অভ্যাস করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) শাবান মাস প্রায় পুরোটাই রোযা রাখতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শাবান মাসের চেয়ে অধিক (নফল) সাওম অন্য মাসে পালন করতে দেখিনি। (বুখারি)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শাবান মাসের অত্যাধিক রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এ মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমি চাই, ফেরেশতাগণ আমার আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট পেশ করার সময় আমি যেন রোযা অবস্থায় থাকি। রমযানের পূর্ববর্তী মাস হওয়ার কারণে শাবান মাসও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আমাদের দেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত শবে বরাত হিসেবে পরিচিত। হাদিসে এ রাতকে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বা 'মধ্য শাবানের রজনী' বলা হয়েছে। এ রাতের ফযিলত ও মর্যাদা বিষয়ে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির (বান্দাদের) প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (ইবন মাজাহ) তাই এ রাতে এমন কাজ করবো, যাতে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয় ও আমাদের মাঝে ভালোবাসা তৈরি হয়। আমরা অন্যকে ক্ষমা করে দিব ও অপরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

এ রাতে অনেক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী সুন্দর পোশাক পরিধান করে, আতর ও সুরমা মেখে মসজিদে সমবেত হতেন এবং সালাত আদায় করতেন। তাই আমরা মধ্য শাবানের রাতে যথাসাধ্য ইবাদাত করবো, নফল সালাত আদায় করবো, আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো ও দিনে রোযা রাখবো। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ এ তিন দিন রোযা রাখতেন। অনেকে শবে বরাতের রাতে আতশবাজি করে, মোমবাতি জ্বালায়। এগুলো অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আমরা এসব শরিয়তবিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকবো।

আমরা রজব ও শাবান মাসের হিসাব রাখব। সম্ভব হলে আমরা রমযানের চাঁদ দেখার চেষ্টা করবো। চাঁদ দেখা সুন্নাত। কিন্তু আমরা বর্তমানে এ বিষয়ে খেয়াল রাখি না।

রমযান কুরআন নাযিলের মাস। তাই এ মাস আসার আগে থেকেই আমরা বেশি বেশি কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করবো। জামাতে সালাত আদায়ের অভ্যাস করবো ও নফল সালাত আদায় করবো। গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করবো। যথাযথ পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো কাজেই সফল হওয়া যায় না। তাই রমযানের জন্য আমরা প্রস্তুতি

নেব। যে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করবে, রমযানে সে যথাযথ ইবাদাত করতে পারবে। আর প্রস্তুতির অভাবে আমরা যদি ইবাদাত করতে না পারি, তাহলে রমযানের রহমত-বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোমলিন হোক, যে রমযান পেল অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারলো না। (তিরমিযি)

রমযান মাস আসার আগেই আমরা সারাদিনের ইবাদাতের পরিকল্পনা করবো। যেন কোনো ভাবেই রমযানের রহমত, বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত না হই।

রমযান মাসের ফযিলত

রমযান বছরের শ্রেষ্ঠ মাস। রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের এক অনন্য মাস রমযান। এ মাসেই মহান আল্লাহ কুরআন মাজিদ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ

অর্থ: ‘রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।’ (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

অন্য আসমানি কিতাবসমূহও রমযান মাসেই নাযিল হয়েছে। ইবরাহিম (আ.)-এর ওপর সহিফাসমূহ রমযানের প্রথম রাতে নাযিল হয়। ষষ্ঠ রমযানে তাওরাত নাযিল হয়। তেরোতম রমযানে ইনজিল নাযিল হয়। আঠারতম রমযানে যাবুর নাযিল হয়। কুরআন মাজিদ নাযিল হয় রমযান মাসের কদর রাতে।

কুরআন মাজিদই রমযানের সুমহান মর্যাদার কারণ। এ মাসে আসমান থেকে রহমত নাযিল হতে থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘রমযানে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়।’ (বুখারি)

রমযানে এক মাস সাওম পালন করা ফরয। সাওম আল্লাহ তা‘আলার খুবই পছন্দনীয় ইবাদাত। তাই সাওমের প্রতিদান আল্লাহ তা‘আলা নিজে দিবেন। এ মাসে বান্দা যেহেতু সাওম পালন করে, তাই আল্লাহ তা‘আলা সকল ইবাদাতের সাওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। হাদিসে আরো বর্ণিত আছে, এ মাসে ওমরা আদায় করলে হজের সাওয়াব পাওয়া যায়। (বুখারি)

আল্লাহ তা‘আলা গাফুরুর রাহিম। তিনি আমাদের গুনাহ মাফ করে দিতে চান। আমরা যাতে অন্যায় পথ ছেড়ে আল্লাহ তা‘আলার পথে ফিরে আসি, সে জন্য রমযানে আমাদের গুনাহ মাফের অনন্য সুযোগ রেখেছেন। রমযান

মাসে একজন ঘোষণাকারী ফেরেশতা এ ঘোষণা দিতে থাকেন, 'হে কল্যাণ অনুসন্ধানকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! (পাপ থেকে) বিরত হও।' আল্লাহ তা'আলা রমযানের প্রতি রাতেই অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

রমযান ইবাদাতের মাস। আমরা দিনে সাওম পালন করি আর রাতে তারাবিহর সালাত আদায় করি। সাওম ও তারাবিহর সালাতের ফযিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযানে রোযা রাখেন, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' (বুখারি) রাসুলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, 'যে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযানে রাত জেগে ইবাদাত করে (তারাবিহর সালাত আদায় করে), তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' (বুখারি)

এ মাসেই আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য লায়লাতুল কদর তথা মহিমান্বিত রজনী রেখেছেন, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। নবিজি (সা.) ইরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কদরের রাত জেগে ইবাদাত করে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'। (বুখারি)

কঠিন কিয়ামতের দিনে রোযাদার বান্দার মুক্তির জন্য রোযা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'হে পরওয়ারদিগার! আমি তাকে (রমযানের) দিনে পানাহার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।' কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতের বেলায় নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি। আমার সুপারিশ তার ব্যাপারে কবুল করুন।' তখন উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (বায়হাকী)

এভাবে রোযা, তারাবিহর সালাত ও লায়লাতুল কদরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আমরা যতই অন্যায় করি না কেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত তার চেয়েও বিস্তৃত। তাই রমযানে আমরা যথাযথভাবে সাওম পালন, বেশি বেশি নফল ইবাদাত ও তাওবা করবো যাতে আমাদের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারি। যে রমযান মাস পেল, অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারলো না, তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই। ইচ্ছাকৃত সাওম পরিত্যাগ করা কবিরা গুনাহ। সাওম পরিত্যাগকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। ইচ্ছাকৃত একটি রোযা পরিত্যাগ করলে, সারাজীবন রোযা রাখলেও রমযান মাসের একটি রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা রমযান মাসে বেশি বেশি ইবাদাত করবো, আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত রহমত বরকত লাভে ধন্য হবো।

একক কাজ

নিজেকে পরিশুদ্ধ করি, রমযান মাসে যে ইবাদাতগুলো অভ্যাসে পরিণত করি

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি রমযান মাসের যে ইবাদাতগুলো নিয়মিত পালন করো/করবে তার একটি তালিকা করো।)

রমযান মাসে যেসব ইবাদাত করি	রমযান মাসে যেসব ইবাদাত করবো
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করি।	অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করবো।

লায়লাতুল কদর

কদর অর্থ মহিমান্বিত, সম্মানিত, নির্ধারণ, ভাগ্য। লায়লাতুল কদরকে আমরা মহিমান্বিত রাত্রি বা ভাগ্যরজনী বলতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতকে যে কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন, লায়লাতুল কদর তন্মধ্যে অন্যতম। এটি বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত। এ রাতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

অর্থ: 'লায়লাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।' (সূরা কদর, আয়াত: ৩)

যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরে রাত জেগে ইবাদাত করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক হাজার মাস ইবাদাতের সাওয়াব দান করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কদরের রাত জেগে ইবাদাত করে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'। (বুখারি)

এ রাতে হযরত জিবরাইল (আ.) অগণিত ফেরেশতাসহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত, বরকত ও শান্তির বার্তা নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। তাঁরা রাত জেগে ইবাদাতকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রহমতের দোয়া করেন। ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার রহমতের অবিরত ধারা অব্যাহত থাকে। এ রাতেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের আগামী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। তিনি বান্দার দোয়া

কবুল করেন ও মনোবাসনা পূরণ করেন। তিনি তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন। বান্দা যত গুনাহগারই হোক না কেন, সে যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফ চায়, তিনি গুনাহ মাফ করে তাকে সম্মানিত করেন।

কুরআন মাজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে সমগ্র কুরআন মাজিদ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে জিবরাইল (আ.) সেখান থেকে প্রয়োজন অনুসারে ওহি নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যেতেন। কুরআন মাজিদের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ রাতকে এত বেশি মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ○

অর্থ: 'আমি একে (কুরআন মাজিদকে) বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।' (সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩)

লায়লাতুল কদরের অনুসন্ধান

এ রাতকে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দেননি বরং গোপন রেখেছেন, বান্দা যাতে বেশি বেশি ইবাদাত করে। রাসুল (সা.) রমযান মাসের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করতে বলেছেন। হাদিসে পবিত্র রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহের কথাও বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ অনেক প্রসিদ্ধ আলিম রমযান মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত ২৭ তারিখের রাতকে লায়লাতুল কদর বলে চিহ্নিত করেছেন।

আমাদের উচিত রমযান মাসের শেষ দশকে রাত জেগে বেশি বেশি ইবাদাত করা, যাতে কোনো অবস্থাতেই এ মহিমান্বিত রাতের রহমত-বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত না হই। যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরের রহমত-বরকত থেকে বঞ্চিত হয়, তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই।

লায়লাতুল কদরের আমল

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর কাছে লায়লাতুল কদরের দোয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়াটি শিখিয়ে দেন:

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।' (তিরমিযি)

রমযানের শেষ দশক ইতিকাফের সময়। ইতিকাফ হলো ইবাদাতের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। নারীরা তাদের বাসগৃহে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করবে। এ সময় ইতিকাফে থাকলে দশ দিনই ইবাদাতের মাধ্যমে কাটানো যায়, ফলে লায়লাতুল কদরের বরকত লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

যে যত বেশি ইবাদাত করবে, সে তত বেশি সাওয়াব পাবে। আমরা এ রাতসমূহে তারাবির সালাত আদায় করবো, যথাসম্ভব কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করবো, তাসবিহ পাঠ করবো, জিকির করবো, তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবো, রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করবো। আমাদের পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য দোয়া করবো। কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবো। এভাবে ফজর নামায পর্যন্ত ইবাদাত করবো, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন লায়লাতুল কদরের তাৎপর্য জেনেছি, লায়লাতুল কদরের যে যে ইবাদাতসমূহ আমি করবো। (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তোমরা বাড়ি থেকে পূরণ করে নিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার পরিবারের সদস্য, সহপাঠী বা শিক্ষকদের সাহায্য নিতে পারবে।)
লায়লাতুল কদরের যে যে ইবাদাতসমূহ আমি করবো :
১.
২.
৩.
৪.

লায়লাতুল ক্বদর নিয়ে আলোচনা করি ও সে অনুযায়ী আমল করি।

১) লায়লাতুল কদরকে কি আমরা অন্য কোনো নামে জানি?
২) এক হাজার মাসে কত বছর হয়?
৩) রমযান মাসের শেষ দশ দিন কোন কোন ইবাদাত করলে লায়লাতুল কদরের ফযিলত পাওয়া যাবে?
৪) লায়লাতুল কদরের ইবাদাতের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করি ও সে অনুযায়ী আমল করি।

তাকওয়া অর্জনে সাওম

তাকওয়া ও সাওমের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাকওয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ অন্যায় থেকে দূরে থাকা, আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া। তাকওয়ার কারণে মানুষ হারাম কাজ থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে সাওম পালনের জন্য আল্লাহর আদেশে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বান্দা পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে দূরে থাকে অথচ সেগুলো হালাল। তাই সাওম উঁচু স্তরের তাকওয়াপূর্ণ ইবাদাত। তাকওয়া ব্যতীত সাওম পালন সম্ভব নয়। কারণ সাওম পালনকারীর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকলে সে লুকিয়ে খাবার খেতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর ভয়েই সে সারাদিন পানাহার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন যাতে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারি।

মহান আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

সাওমের তিনটি দিক রয়েছে, রমযান মাসে সাওম পালনের ক্ষেত্রে এই দিকগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করলে আমরা পরিপূর্ণ মুত্তাকী হতে পারবো ।

প্রথম: সাওম পালনকারী ব্যক্তি পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে দূরে থাকে। এর মাধ্যমে নফস (কুপ্রবৃত্তি) দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্যায় কাজের প্রতি মানুষের সহজাত তাড়না কমে যায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে যায়। ফলে রোযাদারের মনে আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রবল হয়।

দ্বিতীয়: রমযান মাসে সাওম পালনকারী দিনে রোযা রাখে, রাতে তারাবিহ সালাত আদায় করে। এভাবে দিন-রাত ইবাদাতে মশগুল থাকে। ক্ষুধাতুর শরীর অন্যায় কাজে সাড়া দেয় না। ফলে সাওম শয়তানের পথ রুদ্ধ করে, মানুষকে গুনাহ বর্জন করতে সাহায্য করে। সবাই ইবাদাতে উদ্বুদ্ধ থাকে। সমাজে অশ্লীল কাজ কমে যায়। রোযাদার অশ্লীল কথা বলে না ও অশ্লীল কাজ করে না। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'সাওম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন রোযা রেখে অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় ও ঝগড়া-বিবাদ না করে। কেউ যদি তাঁকে গালি দেয় অথবা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার।' (বুখারি)

তৃতীয়: রমযানে এক মাস সিয়াম পালন করে রোযাদার পানাহার বর্জন ও গুনাহের কাজ পরিত্যাগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সে আল্লাহর ইবাদাতের প্রকৃত স্বাদ পেতে শুরু করে। ইবাদাতের প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়। রোযাদার খাবার সামনে নিয়ে বসে থাকে অথচ আহার করে না। এভাবে রোযা ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রোযা সবরের অর্ধেক।' মানুষ পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্যই বেশিরভাগ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। রোযা যেহেতু মানুষকে উভয় কাজ থেকে দূরে রাখে তাই আল্লাহকে স্মরণ করা সহজ হয়।

শয়তানের প্ররোচনা রোযাদারকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। এভাবে রোযাদার আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়।

সাওম আমাদেরকে তাকওয়ার পথ দেখায়। তাকওয়ার মাধ্যমে ইবাদাতে ইখলাস তৈরি হয়। ইখলাস অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা ইখলাসপূর্ণ ইবাদাত কবুল করে উত্তম প্রতিদান দেন। ইখলাসের বিপরীত হলো রিয়া বা লৌকিকতা। রিয়া ইবাদাতকে ধ্বংস করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা রোযা রাখে কিন্তু মিথ্যা কথা বলা ও অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ
فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করলো না, এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' (বুখারি)

শ্রেণিকক্ষে বসে থেকেও কোনো শিক্ষার্থী যদি শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে ঐ শিক্ষার্থী যেমন কোনো কিছুই শিখতে পারে না, ঠিক তেমনি সারাদিন পানাহার ত্যাগ করেও, মিথ্যা ও অশ্লীলতা বর্জন করতে না পারলে, রোযাদার কোনো সাওয়াব পায় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ إِلَّا الْجُوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ
لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ إِلَّا السَّهَرُ

অর্থ: 'অনেক রোযাদার রোযা থেকে ক্ষুধার কষ্ট ব্যতীত আর কিছু লাভ করতে পারে না। অনেক তাহাজ্জুদ আদায়কারী তাহাজ্জুদ থেকে রাত জাগরণ ব্যতীত আর কিছু লাভ করতে পারে না।' (ইবন মাজাহ)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে অসংখ্য আয়াতে আমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে আদেশ দিয়েছেন। কারণ মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান। কুরআন মাজিদের ঘোষণা, 'তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান, যার তাকওয়া সবচেয়ে বেশি।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩) রমযানের রোযা আমাদের এই তাকওয়া অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঈদুল ফিতর

ঈদ অর্থ খুশি, আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ফিতর অর্থ রোযা ভঙ্গ করা। ঈদুল ফিতরের আভিধানিক অর্থ রোযা ভঙ্গ করার উৎসব। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। এক মাস সাওম পালন করার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা শাওয়াল মাসের প্রথম দিনকে রোযাদারের জন্য আনন্দ উদযাপন করার দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মহানবি (সা.) হিজরতের পর মদিনায় এসে মদিনাবাসীদের নির্দিষ্ট দুই দিন আনন্দ-উৎসব ও খেলাধুলা করতে দেখলেন। মহানবি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'দিন কিসের? তারা বললো, আমরা জাহিলি যুগে এ দুই দিন আনন্দ-উৎসব ও খেলাধুলা করতাম। তখন মহানবি (সা.) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ দুই দিনের পরিবর্তে তোমাদের জন্য এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটি দিন দান করেছেন। আর তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। (আবু দাউদ)

দলগত কাজ

ঈদের দিনে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলি

উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে ঈদের দিনে করণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলোর তালিকা তৈরি করো।

ঈদের দিনে করণীয়	ঈদের দিনে বর্জনীয়
সুন্দর পোশাক পরিধান	বাজি, পটকা ফোটানো

ঈদুল ফিতরের দিনে করণীয়

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের সালাত খোলা ময়দানে বা ঈদগাহে আদায় করা উত্তম। মসজিদেও ঈদের সালাত আদায় করা যায়। উৎসব উদযাপনেও ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে গুরুত্ব দিয়েছে। অভাবী ও গরীব মানুষেরাও যেন উৎসব উদযাপন করতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। কোনো কারণে আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে আদায় করতে হবে। কিন্তু দেরি করার কারণে এটি সাধারণ দান হিসেবে পরিগণিত হবে।

ঈদের দিনের কিছু সুন্নাত আমল নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা।

২. সকালে কিছু খেয়ে ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়া। সাধারণত রাসুলুল্লাহ (সা.) বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদের সালাত আদায় করতে যেতেন।

৩. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধান করে ঈদগাহে যাওয়া। আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা ও চোখে সুরমা লাগানো।

৪. যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়া।

৫. ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়ার সময়, সালাত আদায়ের আগে ও ঈদগাহে অবস্থানকালে তাকবির বলা। তাকবির বিভিন্নভাবে পড়া যায়৷ সাধারণত আমরা নিম্নোক্ত তাকবির পাঠ করি।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

উচ্চারণ: 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।'

অর্থ: 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আর তিনিই মহান, তিনি মহান ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা।'

৬. এক পথে ঈদগাহে যাওয়া ও ভিন্নপথে বাড়ি ফেরা। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঈদের দিন বাড়ি ফেরার সময় ভিন্ন পথে ফিরতেন।' (বুখারি)

৭. শিশুদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঈদের সালাত আদায়ের জন্য পরিবারের শিশুদের নিয়ে আসতেন।

৮. সালাত শেষে খুতবা শোনা। খুতবা না শুনে চলে আসলে গুনাহগার হতে হবে।

ঈদের আনন্দ উদযাপন

ঈদের দিন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে কুশল বিনিময় করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিৎ। সাহাবিগণ ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় বলতেন 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম'। অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের ভালো কাজগুলো কবুল করুন।' আমরা ঈদ মুবারক বা ঈদুকুম সাঈদ (তোমাদের ঈদ সৌভাগ্যমন্ডিত হোক) বলেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারি। আমাদের উচিত ঈদের দিন সামর্থ্যানুযায়ী উত্তম খাবারের আয়োজন করা, নিজে আহার করা, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে আপ্যায়ন করা।

ঈদের আনন্দ উদযাপনের জন্য শরিয়ত অনুমোদিত খেলাধুলারও আয়োজন করতে পারি। ঈদের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের লাঠি খেলা ও আনন্দ করার কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আনন্দ উদযাপনের পাশাপাশি আমরা আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাইব। কেননা রমযানে যার গুনাহ মাফ হয়নি, তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই। একবার ঈদের দিন আবু হুরায়রা (রা.) উমর ফারুক (রা.) এর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, হযরত উমর (রা.) দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন। আবু হুরায়রা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আমিরুল মু'মিনিন! লোকেরা আনন্দ উদযাপন করছে আর আপনি কাঁদছেন?' উমর ফারুক (রা.) বললেন, 'আনন্দিত লোকেরা যদি জানতো, তাহলে তারা আনন্দ উদযাপন করতো না'। একথা বলে তিনি পুনরায় কান্না শুরু করলেন আর বললেন, 'তাদের আমল (রমযানের সাওম, সালাত ও ইবাদাত) যদি কবুল হয়ে থাকে, তবে তারা আনন্দ উদযাপন করতে পারে। কিন্তু তাদের আমল যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাদের কান্না করা উচিত। আর আমি জানি না আমার আমল কবুল হয়েছে নাকি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে'।

তাই ঈদের খুশির আতিশয্যে আল্লাহকে আমরা ভুলে থাকবো না। এমন কাজ করবো না, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) অপছন্দ করেন। আমরা ঈদের আনন্দ উদযাপনে, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলনে শালীনতা বজায় রাখবো। নতুন পোশাক পরিধান করলেও অহংকার প্রকাশ করবো না। নতুন পোশাক না থাকলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো। ঈদের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের,

পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য দোয়া করবো। আমাদের নিকটজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের কবর যিয়ারত করবো ও তাদের মাগফিরাত কামনা করবো। সর্বোপরি সবাই পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য ভুলে প্রকৃত মুসলিম হবো এবং একতার বন্ধনে আবদ্ধ হবো।

বাড়ির কাজ

সাওমের শিক্ষা চর্চার কৌশল

সাওমের শিক্ষা/তাৎপর্য তোমার বাস্তব জীবনে/দৈনন্দিন কাজে কীভাবে অনুশীলন/ চর্চা করবে তার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করো।

(উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে তুমি তোমার মা-বাবা/অভিভাবক/ধর্মীয়জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারো।)

সাওমের শিক্ষা	যেভাবে চর্চা করবো	চর্চা করা হয়েছে	মন্তব্য (অভিভাবক)
ভ্রাতৃত্ববোধ	অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করবো		

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

প্রিয় শিক্ষার্থী, যাকাত ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। এটি একটি আর্থিক ইবাদাত। আমরা পূর্বের শ্রেণিতে এ সম্পর্কে শিখেছি। এই অভিজ্ঞতায় আরো বিস্তারিত পরিসরে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত, যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব, যাকাত আদায় না করার পরিণাম, যাকাতের নিসাব এবং যাকাত হিসাব করার নিয়ম সম্পর্কে জানব। চলো আমরা অভিজ্ঞতাটি শুরুর আগে যাকাত সংক্রান্ত একটি ইসলামি ঘটনা শুনি।

বাড়ির কাজ

তুমি যাকাত সংক্রান্ত যে ইসলামিক ঘটনা/ গল্প শুনেছ বা জেনেছ তা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য/সহপাঠীর সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করো। ঘটনা/গল্পটি সংক্রান্ত তার/তাদের মতামত লিখে আনবে।

....

....

যাকাত পরিচিতি

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ) অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এছাড়া আধিক্য, বরকত ইত্যাদি অর্থেও যাকাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির মনের কলুষতা দূরীভূত হয় এবং তাঁর সম্পদও পবিত্র হয়। এ জন্য এর অর্থ পবিত্রতা। তাছাড়া যাকাত দানকারীর সম্পদে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেন। যাকাত প্রদানের ফলে সমাজে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। এভাবে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদও বৃদ্ধি পায়। এজন্য যাকাতের অন্য অর্থ বৃদ্ধি।

ইসলামের পরিভাষায় ধনী ব্যক্তির সম্পদে দরিদ্র, অসহায়, গরীব, অভাবী ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের আল্লাহ কর্তৃক সুনির্ধারিত যে অংশ রয়েছে, তা যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়ার নামই যাকাত। যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ○

অর্থ: 'আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

মহানবি (সা.) বলেন–

اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ

অর্থ: 'তোমরা তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর।' (তিরমিযি)

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

নামাযের মতো যাকাতও মুসলিমদের জন্য ফরয। কিন্তু সকলের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক নয়। বরং যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. **মুসলমান হওয়া:** যাকাত ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। কারণ যাকাত একটি ইবাদত। আর কাফির বা অমুসলিমের পক্ষ থেকে ইবাদত সাব্যস্ত হতে পারে না । তাই অমুসলিমের উপর যাকাত ফরয নয়। কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তবেই তাকে যাকাত দিতে হবে। মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে ইয়ামেন পাঠালেন ও বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের কাছে যাত্রা করছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার প্রতি আহ্বান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। যদি তারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবহিত করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের (ধনীদের) উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

২. **নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া:** নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সমমূল্যের সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয়। কোনো মুসলিম ব্যক্তির নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) এ পরিমাণ সম্পদকে যাকাত ফরয হওয়ার কারণরূপে নির্ধারণ করেছেন। (হিদায়া)

৩. **নিসাব পরিমাণ সম্পদ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া:** নিজের পরিবারের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন: খাদ্যসামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, যানবাহন, কৃষি কাজের উপকরণ, শিক্ষাসামগ্রী ইত্যাদি ব্যতীত অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হতে হবে। সারা বছর এসব মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে, শুধু তার উপর যাকাত ফরয হবে।

৪. **ঋণগ্রস্ত না হওয়া:** ঋণমুক্ত হওয়া যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত। কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয নয়। তবে ঋণ পরিশোধের পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে। নিজ ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ নেওয়া হয়, তার সমপরিমাণ সম্পদ বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করতে হবে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ উন্নয়নের জন্য যে ঋণ নেওয়া হয়, যেমন: কল-কারখানা বানানো, ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাড়ি বানানো অথবা অন্য যে কোনো ধরনের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিলে যাকাত হিসাবের সময় সে ঋণ ধর্তব্য হবে না। এ ধরনের ঋণের কারণে যাকাত কম দেওয়া যাবে না। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

৫. **সম্পদ এক বছর স্থায়ী হওয়া:** নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর নিজ আয়ত্তাধীন থাকা যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত। তাই নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর কাল স্থায়ী না হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সম্পদের যাকাত নেই।' (ইবন মাজাহ) তবে কৃষিজাত ফসল, খনিজদ্রব্য ইত্যাদির যাকাতের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়।

৬. **জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া:** যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত বিবেকবান ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। বিবেক-বুদ্ধিহীন পাগলের উপর উপর যাকাত ফরয নয়।

৭. **বালেগ হওয়া:** যাকাতদাতাকে অবশ্যই বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। বালেগ হওয়ার আগে তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

৮. **স্বাধীন হওয়া:** যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তিকে স্বাধীন বা মুক্ত হতে হবে। পরাধীন ব্যক্তি বা দাস-দাসীর উপর যাকাত ফরয নয়।

এছাড়া যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যাকাতের সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া এবং সম্পদের উপর মালিকের পূর্ণ মালিকানা থাকা আবশ্যক।

দলীয় কাজ

'আমার উপর যাকাত ফরয হলে কেন আমি/আমরা সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করবো'
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি/তোমরা কেন যাকাত প্রদান করবে (ফরয হলে) এ সম্পর্কে তোমার নিজস্ব ভাবনা লিখে উপস্থাপন করো।)

যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

যাকাত মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় ইবাদাত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে এটি তৃতীয় স্তম্ভ। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। যথা-

১. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল-এ কথার সাক্ষ্য দান করা;

২. সালাত কায়েম করা;

৩. যাকাত প্রদান করা;

৪. হজ করা এবং

৫. রমযানের সিয়াম পালন করা। (বুখারি)

প্রত্যেক সামর্থ্যবান স্বাধীন মুসলমান নর-নারীকে যাকাত প্রদান করতে হয়। যাকাত প্রদান করলে আল্লাহ তা‘আলা তার সম্পদে বরকত দান করেন এবং এর বিনিময়ে আখিরাতে তাকে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করবেন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ পাক বলেন, ‘হে বনি আদম! আমার পথে খরচ করতে থাকো। আমি আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোমাদের দিতে থাকবো।’ (বুখারি ও মুসলিম)।

কুরআনের অসংখ্য স্থানে নামাযের সাথে সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কেউ এই ফরযকে অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যায়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

অর্থ: ‘মুশরিকদের জন্য শুধুই ধ্বংস, যারা যাকাত আদায় করে না, তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী (কাফির)।’ (সূরা হা-মিম আস সাজদাহ, আয়াত : ৬-৭)

মানুষ তার সম্পদকে বেশি ভালোবাসে। এজন্য মানুষ সম্পদ আহরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে। তাই মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রিয় ধন-সম্পদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ দেখতে চান যে, কে তাঁর আনুগত্য করে এবং কে অবাধ্য হয়। আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেছেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ’। (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৫) মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য সেই সম্পদকে দান করে থাকে।

যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সাহায্য-সহযোগিতা নয়। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করা। একজন মুসলিম স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করার মাধ্যমে তার ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এর ফলে তার মনে ভালোবাসা জন্মায় এবং সে আত্মিক শান্তি পায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তাদের সম্পদ হতে ‘সাদাকা’ গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন। আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনার দোয়া তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩)

দলগত কাজ

‘যাকাত প্রদান করলে আল্লাহ তা‘আলা তার (যাকাত প্রদানকারীর) সম্পদে বরকত দান করেন’ (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দলে বিভক্ত হয়ে দলে/প্যানেলে উপস্থাপনা করো।)

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

যাকাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অবশ্যপালনীয় নির্দেশ। যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত কল্যাণ দান করবেন। আর যাকাত অস্বীকারকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।

যে ব্যক্তি যাকাত অস্বীকার করে এবং যাকাত আদায় করে না, সে মহাপাপী। এ জন্য তাকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُوْنَهَا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ۝

অর্থ: ‘যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন’। (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, ‘সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এগুলোই সে সমস্ত সোনা-রূপা, যা তোমরা জমা করতে। কাজেই তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর’। (সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৩৫)

এ আয়াতে যাকাত প্রদান না করার যে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার এ শাস্তি তারই অর্জন। যাকাত না দিয়ে সম্পদ জমা করে রাখলে, সে সম্পদই তার জন্য কিয়ামতের দিন আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ আয়াতে কপাল, পাঁজর ও পিঠ দগ্ধ করার কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর পথে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোনো ভিক্ষুক কিছু চায়; কিংবা যাকাত প্রত্যাশা করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঁচকে ফেলে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। (কুরতুবি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মুমিনদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এর হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তা দিয়ে তার ললাট, পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে আসবে, পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। আর তার সাথে এরূপ করা হবে এমন এক দিন, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। তার এমন শাস্তি মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে।’ (মুসলিম)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পাশে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল।' (বুখারি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের উটের হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে উট দুনিয়ার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করতে থাকবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বকরির হক আদায় করবে না, সে দুনিয়ার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে মালিককে খুর দিয়ে পদদলিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে।' (বুখারি)

যারা কৃপণতা করে যাকাত আদায় করে না, তাদের জন্য দুঃসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। অপরদিকে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের সন্নিকটে। আর একজন জাহিল দানশীল একজন কৃপণ আবেদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়'। (তিরমিযি)

সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যাকাত। তাই আমাদের কর্তব্য হলো নিজে যাকাত প্রদান করা এবং অন্যকে যাকাত দানে উৎসাহিত করা। এভাবে সমাজের ধনী-গরীবের বৈষম্য কমে আসবে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হবে।

দলগত কাজ

'প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উচিত সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদান করা'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদানের গুরুত্ব দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

যাকাতের নিসাব

নিসাব (نِصَاب) আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলা হয়। অর্থাৎ 'নিসাব' হলো যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণ। সারা বছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তাকে সাহিবে নিসাব বা নিসাবের মালিক বলা হয়। আর সাহিবে নিসাবের উপরই যাকাত ফরয হয়।

নিসাবের পরিমাণ হলো, সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) তোলা রূপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) বা সাড়ে সাত (৭.৫) তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) বা এর সমমূল্যের সম্পদ। এই পরিমাণ নির্ধারণে ব্যক্তির সর্বমোট আয় থেকে যাবতীয় ব্যয় বাদ

দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ এবং তার পূর্বের সঞ্চয় ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যুক্ত হবে। নগদ অর্থ, ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ এবং ব্যবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, শেয়ার, ব্যাংক নোট, স্টক, অংশীদারী কারবার, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি সম্পদ যুক্ত করে যদি উক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয় তাহলে তাকে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। তবে কৃষিজাত দ্রব্য, গবাদি পশু ও খনিজ সম্পদের যাকাতের নিসাব ও যাকাতের হার ভিন্ন ভিন্ন।

নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি সম্পদ কারো কাছে এক বছর কাল স্থায়ী থাকলে ঐ সম্পদের মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসাবে দেওয়া ফরয। শতকরা হিসাবে এর পরিমাণ হলো ২.৫%। কিন্তু সম্পদ নিসাব পরিমাণের কম হলে যাকাত দিতে হবে না। এক বছরকাল পূর্ণ না হলেও তার যাকাত নেই।

উৎপাদিত ফসল ও ফলের নিসাব

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ধান, গম, যবসহ অন্যান্য ফসল অল্প হোক বা বেশি, ভূমি থেকে উৎপাদিত সকল শস্যের উপর উশর ওয়াজিব হবে। তা প্রবাহিত পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক, কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল হলো, রাসুল (সা.) এর বাণী: বৃষ্টির পানি থেকে যা উৎপন্ন করে, তাতে উশর ওয়াজিব হবে। (মুসনাদে আহমদ)

আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ৫ ওয়াসাক হলে উশর ওয়াজিব হবে। এক ওয়াসাক হলো ৬০ সা এর সমপরিমাণ। এক সা হলো ৩২৭০.৬০ গ্রাম তথা ৩ কেজি ২৭০ গ্রামের কিছু বেশি। তাদের দলিল হলো রাসুল (সা.)–এর এই বাণী:

لَيۡسَ فِيۡمَا دُوۡنَ خَمۡسَةِ أَوۡسُقٍ صَدَقَةٌ

অর্থ: পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়। (মুসলিম)

খনিজ সম্পদের নিসাব

স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, সীসা, কিংবা তামা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা বিশভাগ (২০%) যাকাত দিতে হবে। মহানবি (সা.) বলেছেন–

وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

অর্থ: ‘ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব।’ (তিরমিযি)

গবাদি পশুর যাকাতের নিসাব

গরু, মহিষ, উট, ভেড়া, দুম্বা, ছাগল প্রভৃতি গবাদি পশুর নিসাবের পরিমাণ ও যাকাতের হারে ভিন্নতা রয়েছে। গরু বা মহিষ ৩০টি হলে; উট ৫টি হলে এবং দুম্বা, ছাগল বা ভেড়া ৪০টি হলে যাকাত ফরয হয়।

যাকাত হিসাব করার নিয়ম

যাকাত একটি আর্থিক ফরয ইবাদাত। বছরে একবার মালে নিসাবের অধিকারী ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করতে হয়। বছরের একটা নির্দিষ্ট দিন থেকে পরবর্তী বছরের ঐ নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব করে যাকাত প্রদান করতে হয়। এই দিন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোনো মাসের যে কোনো দিন নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত হিসাব সংরক্ষণের সুবিধার্থে কেউ কেউ হিজরি বছরের প্রথম মাস মহররমের কোনো দিন নির্ধারণ করেন। আবার অনেকে বেশি সাওয়াবের আশায় রমযান মাসকে নির্ধারণ করে থাকেন। তবে যখন থেকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তখন থেকেই যাকাতের বছর গণনা শুরু করতে হবে। যে মাস থেকেই হিসাব রাখা হোক না কেন, হিসাব রাখতে হবে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। সংরক্ষিত হিসাব অনুযায়ী নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর কাল স্থায়ী হলে যাকাত প্রদান করতে হবে; অন্যথায় নয়। যাকাত হিসাবের ক্ষেত্রে চন্দ্র বছরের হিসাব ধরা উত্তম।

কোনো ব্যক্তির যেদিন নিসাবের একবছর পূর্ণ হবে, সেদিন তার যাকাতযোগ্য যত সম্পদ আছে, সেগুলো তাকে একত্রে হিসাব করতে হবে। যেমন নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য, ব্যাংকে জমাকৃত টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ, প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকা, সঞ্চয়পত্রসহ অন্যসব জমানো সম্পদ একত্রে করে টাকায় রূপান্তর করে যে পরিমাণ সম্পদ হবে তার উপর ৪০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

স্বর্ণ-রৌপ্য আলাদা আলাদা হিসাব করে যাকাতের নিসাব না হলে দুটোকে একত্র করে হিসাব করে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য যে দ্রব্যের বাজার মূল্য হিসাব ধরলে গরীব ও অসহায় লোকজন বেশি উপকৃত হবে, সে দ্রব্যের বাজার মূল্য হিসাব ধরতে হবে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মোট সম্পদ থেকে ঋণের সমপরিমাণ সম্পদ/টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাকে অবশিষ্ট সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। নিম্নের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ভালোভাবে যাকাতের হিসাব বুঝতে পারবো–

চলো, একটি উদাহরণের মাধ্যমে যাকাতের হিসাব দেখি:

বেগম তাহমিনা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। নিসাব এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর বছর শেষে তাঁর নিকট নগদ অর্থ ৫৫,০০০ টাকা, ব্যবসায়িক সম্পদ ২৩০,০০০ টাকা, ব্যাংকে জমাকৃত ৩৫,০০০ টাকা এবং তার ৫ ভরি স্বর্ণ ও ১০ ভরি রৌপ্য রয়েছে। স্বর্ণের মূল্য ভরি প্রতি ৯০,০০০ টাকা এবং রূপার ভরি ১০,০০০ টাকা। এখন বেগম তাহমিনা কত টাকা যাকাত প্রদান করবেন?

ক্রমিক	সম্পদের নাম	সম্পদের পরিমাণ
১।	নগদ অর্থ	৫৫,০০০ টাকা
২।	ব্যবসায়িক সম্পদ	২,৩০,০০০ টাকা
৩।	ব্যাংকে জমাকৃত টাকা	৩৫,০০০ টাকা
৪।	স্বর্ণ (৫ ভরি × ৯০,০০০)	৪,৫০,০০০ টাকা
৫।	রৌপ্য (১০ ভরি × ১০,০০০)	১,০০,০০০ টাকা
৬।	অন্যান্য	২৫,০০০ টাকা
	মোট সম্পদের পরিমাণ	**৮,৯৫,০০০ টাকা**

এখন বেগম তাহমিনার যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ–	
মোট সম্পদ	৮,৯৫,০০০ টাকা

বেগম তাহমিনার যাকাত দিতে হবে : ৮,৯৫,০০০ টাকার ২.৫% হারে অর্থাৎ ২২,৩৭৫ টাকা (বাইশ হাজার তিনশত পচাত্তর টাকা মাত্র)।

জোড়ায়/দলীয় কাজ

করিম সাহেবের কাছে ৩ তোলা স্বর্ণ, ২০ তোলা রূপা এবং ৪ লাখ টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রয়েছে। তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক জোড়ায়/দলে আলোচনা করে করিম সাহেবের যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় করো।

হজ (اَلْحَجُّ)

হজ আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা করা, নিয়ত করা, বায়তুল্লাহ সফরের সংকল্প করা। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের নিয়তে যিলহজ মাসের নির্দিষ্ট দিনসমূহে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা ও অন্যান্য কাজ সম্বলিত ইবাদাতের নাম হজ। হজ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত এবং ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম রুকন।

সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরয। একাধিকবার হজ আদায় করলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। কেউ হজের বিধান অস্বীকার করলে, সে কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, 'এক দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, 'হে মানব সমাজ! তোমাদের

ওপর হজ ফরয করা হয়েছে। তাই তোমরা হজ আদায় করো।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! তা কি প্রতি বছর?' তিনি নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আমি 'হ্যাঁ' বললে তা (প্রতি বছরের জন্য) ওয়াজিব হয়ে যেত'। (মুসলিম)

যেহেতু মানুষ যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করতে পারে, তাই হজ ফরয হওয়ার সাথে সাথে দেরি না করে তা আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছা করে, সে যেন তা তাড়াতাড়ি আদায় করে নেয়।' (আবু দাউদ) যার ওপর হজ ফরয, কোনো কারণে আদায় না করলে মৃত্যুর পূর্বে হজের ওসিয়ত করা ওয়াজিব। উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ থেকে হজ আদায় না করলে সে গুনাহগার হবে।

হজের ঐতিহাসিক পটভূমি

আল্লাহর নবিগণের স্মৃতিবিজড়িত নগরী মক্কাতুল মুকাররমা, কুরআন মাজিদে যাকে 'উম্মুল কুরা' বা আদি নগরী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম ঘর বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়। কালের বিবর্তনে এ জনপদ জনমানবহীন মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আর সেখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্ধ হয়ে যায়।

হযরত ইবরাহিম (আ.) একজন অত্যন্ত মর্যাদাবান পয়গম্বর বা নবি। তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ইবরাহিম (আ.) স্বীয় স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.) কে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী জনমানবহীন মরুভূমিতে সামান্য কয়েক দিনের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে রেখে আসেন। হযরত হাজেরার আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ছিল। তিনি জানতেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

প্রিয় পুত্র ও স্ত্রীকে একাকী রেখে যাওয়ার সময় হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করলেন। এ দোয়া আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন: 'হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে আপনার পবিত্র ঘরের নিকটে ফসলহীন অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমাদের রব! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহিম (আ.) এর দোয়া কবুল করলেন। যখন ইসমাইল (আ.) ও তাঁর মা হাজেরার খাবার শেষ হয়ে গেল, ইসমাইল (আ.) ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে উঠলেন। মা হাজেরা বারবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের চূড়ায় উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন, কোনো কাফেলা এই পথ দিয়ে যায় কি না। তাহলে তাদের কাছে একটু পানি পাওয়া যেতো। কিন্তু কোথাও কোনো মানুষ তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি এভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করলেন। পানি না পেয়ে মা হাজেরা শিশু ইসমাইল (আ.)-এর কাছে ফিরে আসলেন এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে পেলেন, কাছেই মাটি ফুঁড়ে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা বইছে। এ পানির ফোয়ারাই হলো বিখ্যাত যমযম কূপ। মা হাজেরা শিশু ইসমাইল (আ.)কে

পানি পান করালেন, নিজেও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন।

পানির মাধ্যমে তাঁদের খাবারের সমস্যাও মিটে গেলো। মরুভূমিতে পানির তীব্র সংকট। কোথাও পানি থাকলে সেখানে পাখিরা উড়াউড়ি করে, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। পানির সন্ধানে অনেক কাফেলা সেখানে আসতে লাগলো। তারা পানি সংগ্রহ করে যাওয়ার সময় হযরত হাজেরা (আ.)-কে উপহার স্বরূপ খাদ্যদ্রব্য দিয়ে যেত। এভাবেই সেখানে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়। জুরহাম গোত্রের এক কাফেলা মা হাজেরা (আ.)- এর অনুমতিক্রমে সেখানে বসবাস শুরু করে। ক্রমে আরো মানুষ বসবাস করতে থাকে। মক্কা নগরী ধীরে ধীরে জনপদে রূপান্তরিত হয়। সবাই হযরত ইসমাইল (আ.) ও তাঁর মা হাজেরাকে খুব সম্মান করতেন। কারণ তাঁদের কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা ধু ধু মরুপ্রান্তরে শীতল পানির কূপের ব্যবস্থা করেছেন।

ইসমাইল (আ.) কিশোর বয়সে উপনীত হলে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহিম (আ.) এর ওপর আদেশ হলো প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার জন্য। আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করতে প্রস্তুত হলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

মহান আল্লাহ পিতা ও পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কাবাঘর পুনর্নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি ইবরাহিম (আ.)-কে কাবা ঘরের স্থানটি চিহ্নিত করে দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি ইবরাহিমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম (আর বলেছিলাম) আমার সাথে কাউকে শরিক করো না। আর আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাওয়াফকারী, নামাযে কিয়ামকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারীদের জন্য।' (সূরা আল-হাজ, আয়াত ২৬)

হযরত ইবরাহিম (আ.), ইসমাইল (আ.) এর সহযোগিতায় কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করলেন। এরপর মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

অর্থ: 'হে আমাদের রব! আমাদের এ কাজ আপনি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৭)

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত ইবরাহিম (আ.) মানুষকে বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও হজ করার জন্য আহ্বান করেন। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ

يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অর্থ: 'আর মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা করে দিন, তারা আপনার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সবধরনের কৃশকায় উটের পিঠে করে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।' (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ২৭)

পৃথিবীর নানা প্রান্তের মুমিনগণ বায়তুল্লাহর যিয়ারতে আসতে থাকলো। বায়তুল্লাহ মহান আল্লাহর ইবাদাতের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হলো। ইবরাহিম (আ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ইসমাইল (আ.) নবি হলেন। তিনি কাবা শরিফের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এভাবে বংশানুক্রমিকভাবে তারা কাবা শরিফের তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু কালক্রমে মানুষ আবার মহান আল্লাহকে ভুলে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। কাবাগৃহে ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করে পূজা শুরু করে। হজ পালনের জন্য তারা নানা ভ্রান্ত নিয়ম চালু করে। তারা বিবস্ত্র হয়ে কাবাগৃহ তাওয়াফ করতো, আরাফার ময়দানে অবস্থান না করে আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য মুযদালিফায় অবস্থান করতো। কিন্তু তখনো কুরাইশরাই কাবা শরিফ ও হজের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আরব অঞ্চল ও অন্যান্য দেশে তাদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাদের মাঝে অল্প সংখ্যক লোক ছিল তখনো মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন। তাদেরকে হানিফ বা আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ ইবাদাতকারী বলা হতো। তারা মূর্তিপূজা না করে ইবরাহিম (আ.)-এর অনুসরণে হজ আদায় করতেন। আমাদের প্রিয় মহানবি (সা.) এমন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছোটোবেলা থেকে মূর্তিপূজা ঘৃণা করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের পর পুনরায় কাবা ঘরকে মূর্তিমুক্ত করেন ও হযরত ইবরাহিম (আ.)- এর অনুসরণে হজের বিধানাবলি প্রবর্তন করেন।

হজের ফযিলত

হজ মুসলিম জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন আমলটি উত্তম?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান আনা।' প্রশ্ন করা হলো, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হলো, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'মকবুল হজ।' (বুখারি)

আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির হজ কবুল করেন, তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাত দান করেন। মহানবি (সা.) বলেন 'তোমরা হজ ও ওমরাহ মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখো। কেননা এ ইবাদাত দু'টি দরিদ্রতা ও গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন (কামারের আগুনের) হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূর করে বিশুদ্ধ করে দেয়। আর কবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'। (তিরমিযি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন–

مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ করলো আর হজ পালনের সময় কোনো অশ্লীল কাজ করেনি এবং কোনো প্রকার পাপাচারে নিমজ্জিত হয়নি, সে হজ থেকে এমন নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তাঁর মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।' (বুখারি)

হজের গুরুত্ব

হজের বিধান ফরয হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ

অর্থ: 'আর তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬)

বায়তুল্লাহর হজ চালু থাকা মুমিন জীবিত থাকার দলিল। আর যতদিন কোনো মুমিন পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ

অর্থ: 'বায়তুল্লাহর হজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না' (বুখারি)

হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলে, হজ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে হজের সাওয়াব দান করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি হজ, ওমরাহ অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে বের হবে আর পথেই মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে গাজি, হাজী বা ওমরাহ পালনকারীর সাওয়াব প্রদান করবেন'। (বায়হাকী)

রাসুলুল্লাহ (সা.) সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ পালনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট অভাব বা অত্যাচারী শাসকের বাধা অথবা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া ব্যতীত হজ পালন না করে মৃত্যুবরণ করলো, সে ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করুক বা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না'। (দারিমি)

হজের তাৎপর্য

হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। হজ পালনের সফরে আমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করতে পারি, ফলে আমাদের ঈমান মজবুত হয়। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শনাবলির সম্মান সম্পর্কে বলেন–

وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝

অর্থ: 'যে আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা তাঁর অন্তরের তাকওয়া থেকেই করে।' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩২)

হজ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যম। হজ মানুষকে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনে।

মানুষ তাওবা করে, আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়। সাদা ইহরামের কাপড় তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষ তাঁর অসহায়ত্ব বুঝতে পারে। তাইতো আমরা হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মানুষের মাঝে আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি।

হজ ইসলামের সাম্যনীতির প্রমাণ। লাখ লাখ হাজী সবাই একই পোশাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাব্বাইক ধ্বনিতে নিজেদের উপস্থিতির জানান দেয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই সমান, সেটার স্পষ্ট প্রমাণ হজে পাওয়া যায়। হজের মাধ্যমে মুসলিমদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়। দেশ, ভাষা ও জীবনাচার আলাদা হওয়ার পরও সবাই সুশৃঙ্খলভাবে হজের কার্যাবলি আদায় করে, একে অপরকে সহযোগিতা করে। এক অতুলনীয় আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তের মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায়। তাদের মাঝে আলোচনা করার ও সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। হজের ইমাম আরাফার ময়দানে বিশ্ব মুসলমানদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

একজন মুমিন বান্দা প্রতিদিন বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। হজের সফরে তিনি বায়তুল্লাহকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর রওজা মুবারক যিয়ারাত করারও সুযোগ পান। এসব মহিমান্বিত স্থানগুলোর ভ্রমণ মানুষের অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুমিন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে শুরু করে।

একক/জোড়ায় কাজ

শিক্ষকের আজকের আলোচনার আলোকে শিক্ষার্থীরা হজের তাৎপর্য খাতায় (একক/জোড়ায়) লিখবে।

হজের ফরয

হজের ফরয তিনটি:

১. হজের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা।

২. উকূফে আরাফা অর্থাৎ ৯ই যিলহজ যোহর থেকে ১০ই যিলহজ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা অর্থাৎ ১০ই যিলহজ ভোর থেকে ১২ যিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোনো সময় কাবা শরিফ তাওয়াফ করা।

হজের ওয়াজিব

হজের ওয়াজিবসমূহ–

১. মিকাত অতিক্রম করার আগেই হজের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা।

২. ৯ যিলহজ আরাফার ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা।

৩. আরাফা থেকে মিনায় ফেরার পথে ১০ই যিলহজ ফজর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা।

৪. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা বা দৌড়ানো।

৫. ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ শয়তানকে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।

৬. মাথা মুন্ডন করা বা চুল ছোট করা।

৭. মক্কার বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য বিদায়কালীন তাওয়াফ বা তাওয়াফুল বিদা করা।

৮. তামাত্তু ও কিরান হজ আদায়কারীগণের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ কুরবানি করা।

হজের সুন্নাত

হজের সুন্নাতসমূহ-

১. ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা; সম্ভব না হলে ওযু করা।

২. বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা।

৩. মক্কার বাইরে থেকে আগত ব্যক্তিদের জন্য তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা।

৪. তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্কর সৈনিকের মতো বীরদর্পে চলা।

৫. ইমামের জন্য ৩টি খুতবা দেওয়া। ইমাম ৭ই যিলহজ তারিখ মক্কায়, ৯ই যিলহজ আরাফায় যোহরের নামাযের পূর্বে, ১১ই যিলহজ মিনায় যোহরের নামাযের পর হজের খুতবা প্রদান করেন।

৬. ৮ই যিলহজ মক্কা থেকে মিনায় যাত্রা করা, সেখানে পৌঁছে যোহর থেকে ৯ যিলহজ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।

৭. ৯ই যিলহজ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া।

৮. উকুফে আরাফা বা আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে গোসল করা।

৯. আরফার ময়দান থেকে ফেরার সময় ইমাম রওনা হওয়ার পরে রওনা হওয়া।

১০. আরাফা থেকে ফিরে মুযদালিফায় রাত কাটানোর পর ১০ই যিলহজ ফজরের নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া।

১১. জামরায় পাথর নিক্ষেপের জন্য ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ মিনায় রাত্রিযাপন করা।

১২. যিলহজ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ পথর নিক্ষেপের সময় ক্রমধারা ঠিক রাখা।

১৩. মিনা থেকে ফেরার পথে 'মুহাসসার' নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করা।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

যেসব কার্যক্রমের মাধ্যমে হজের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত আদায় করা হয়।

তুমি/তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক নিচের ছকটি পূরণ কর।

ক্রমিক	হজের নিয়ম	কার্যাবলি
১.	ফরয	
২.	ওয়াজিব	
৩.	সুন্নাত	

হজ ফরয হওয়ার শর্ত

হজ ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি। যথা,

১. **মুসলিম হওয়া**

হজ ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে মুসলিম হওয়া।

২. **বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া**

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার ওপর হজ ফরয নয়। তবে তারা যদি হজ আদায় করে, হজের সাওয়াব পাবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হলে, তাদেরকে আবার হজ আদায় করতে হবে।

৩. **বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া**

বোধশক্তিহীন ব্যক্তির ওপর হজ ফরয নয়।

৪. **স্বাধীন হওয়া**

কোনো পরাধীন ব্যক্তির ওপর হজ ফরয নয়।

৫. **শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা**

যে ব্যক্তি মক্কা শরিফ পর্যন্ত হজের সফরের যাতায়াত ও হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার-

পরিজনের অত্যাবশকীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ আছে, তার ওপর হজ ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ

অর্থ: 'আর যে ব্যক্তির সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, তার ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ ঘরের হজ করা ফরয।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭)

আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি হজের সফর করতে অক্ষম হন, তিনি অন্যের মাধ্যমে হজ আদায় করবেন। এমন হজকে বদলি হজ বলে। তবে কোনো ব্যক্তির হজ যাত্রার পথ নিরাপদ না হলে তার উপর হজ ফরয হবে না।

হজ আদায়কারী যদি মহিলা হন, তার সাথে তার স্বামী বা কোনো মাহরাম থাকতে হবে। ইসলামি শরিয়ায় মাহরাম বলা হয় এমন নিকটাত্মীয়কে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। যেমন, বাবা, চাচা, মামা, ভাই, ছেলে ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে'। (বুখারি)

হজের মিকাত

ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থানকে মিকাত বলা হয়। হজ ও ওমরার জন্য বায়তুল্লাহ যাওয়ার পথে মিকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। আকাশপথে বা জলপথে বা স্থলপথে যারা হজে গমন করেন, তাদেরকেও এই স্থানগুলা অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে হয়। অঞ্চলভেদে মহানবি (সা.) ইহরামের জন্য পাঁচটি স্থানকে মিকাত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মিকাত বা ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থানগুলো নিম্নরূপ:

১. ইয়ালামলাম

ইয়ালামলাম একটি উপত্যকা যা মক্কা থেকে বিরানব্বই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি ইয়ামেনবাসী ও সে পথে আগমনকারী হাজীদের মিকাত। এটি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে আগত হাজীদেরও মিকাত। যেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশের হাজীগণ আকাশপথে হজে গমন করেন, তাই যারা সরাসরি বায়তুল্লায় যান তারা ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইটে উঠার আগেই ইহরাম বাঁধেন। তবে যারা শুরুতে মদিনায় যান, তাদেরকে ঢাকা থেকে ইহরাম বাঁধতে হয় না।

২. যুল-হুলায়ফা

মদিনা মুনাওয়ারা থেকে ও এ পথে মক্কা শরিফ আগমনকারীদের মিকাত হচ্ছে যুল হুলায়ফা। বর্তমানে এটি আবইয়ারে আলি বা বীরে আলি নামে পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে হজ আদায় করতে যাওয়ার সময় যারা আগে মদিনায় যান, তাঁরাও হজ ও ওমরা পালনের জন্য যুলহুলাইফা থেকে ইহরাম বাঁধেন।

৩. যাতে ইরাক

ইরাকবাসী ও সে পথে আগমনকারী হাজীদের মিকাত। এটি একটি উপত্যকা।

৪. জুহফা

মিসর ও সিরিয়াবাসী এবং সেই পথে মক্কা মোকাররমা আগমনকারীদের মিকাত। এটি রাবাগ নামক স্থানের একটি বিরান গ্রাম। রাবাগে পৌঁছে ইহরাম বাঁধলেও কোনো সমস্যা নেই।

৫. করনুল মানাজিল

এটি নজদবাসী ও সে পথে আগমনকারীদের জন্য মিকাত তথা ইহরাম বাঁধার স্থান। এটি বর্তমানে 'আস-সায়েল' নামে পরিচিত।

হেরেমের বাইরে কিন্তু বর্ণিত পাঁচটি মিকাতের সীমানার ভেতরে যারা বসবাস করেন যেমন জেদ্দা, বাহরা, তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকার বাসিন্দাগণ বা চাকরিরত বিদেশিগণ, হজের জন্য তাদের নিজেদের ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধা উত্তম। তারা চাইলে হেরেমের চৌহদ্দির বাইরে যে কোনো স্থান তথা সমগ্র 'হিল' থেকেও ইহরাম বাঁধতে পারেন। হেরেমের বাইরের এলাকা হলো 'হিল'। যারা হেরেমের ভেতরে বসবাস করেন তারা হজের ইহরাম হলে নিজ নিজ ঘর থেকে, আর ওমরাহর ইহরাম হলে হেরেমের সীমানার বাইরে যে কোনো স্থানে গিয়ে ইহরাম বাঁধবেন।

হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে ইহরাম ব্যতীত মিকাত অতিক্রম করা জায়েজ নেই। কেউ ইহরাম ব্যতীত মিকাত অতিক্রম করলে, তাকে ইহরাম বাঁধার জন্য মিকাতে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। যদি সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। তখন তার ওপর দম বা পশু কুরবানি দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে।

হজ পালনের নিয়ম

জাহেলি যুগে হজ পালনের ক্ষেত্রে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যেমন তারা হজের নিয়ত করলে হজ আদায় না করা পর্যন্ত ঘরের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ হিসেবে বিশ্বাস করতো। তাই তারা সব সময় পেছনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) সেসব কুসংস্কার দূর করেছেন। হজ ফরয হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের হজের বিধান শিক্ষা দিয়েছেন। চলো এবার আমরা হজের নিয়মাবলি শিখি।

ইহরাম

ইহরাম আরবি শব্দ যার অর্থ নিষিদ্ধ। ইহরাম হজের আনুষ্ঠানিক নিয়ত। নির্দিষ্ট দিনে মিকাত থেকে ইহরামের কাপড় পরিধান করে হজের নিয়ত করাকে ইহরাম বলে। ইহরাম বাঁধার সাথে সাথে হজের নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে দূরে থাকতে হবে। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে যিলহজ মাসের নয় তারিখের মাঝে যে কোনো সময় নির্দিষ্ট মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়। এর আগে বা পরে ইহরাম বাঁধলে হজ আদায় হবে না। ওযু ও

গোসল করে দুই রাকাআত নফল সালাত আদায় করে ইহরাম বাঁধতে হয়। ইহরাম বাঁধার সময় পুরুষের জন্য ইহরামের নির্দিষ্ট কাপড় তথা সেলাইবিহীন দুইটি চাদর পরিধান করতে হয়। নারীগণ স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করবে, তবে মুখ খোলা রাখবে। কিবলামুখী হয়ে পুরুষগণ সশব্দে আর নারীগণ নিরবে তিনবার তালবিয়ার পাঠ করবে। আর তালবিয়া হলো–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ -

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ - لَا شَرِيْكَ لَكَ

অর্থ: 'আমি আপনার সমীপে হাযির, হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে হাজির। আমি আপনার সমীপে হাযির, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি আপনার সমীপে হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামতরাজি ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোনো শরিক নেই।' (বুখারি)

তারপর দরুদ পাঠ করে নিজের ইচ্ছামতো দোয়া করতে হয়। ইহরাম বাঁধার পর দোয়া করা সুন্নাত। হজ ও ওমরাহর উদ্দেশ্য ছাড়াও বহিরাগত কেউ (মক্কার বাইরে বসবাসকারী) বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে গেলে, তাকেও মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়।

তাওয়াফে কুদুম

তাওয়াফে কুদুম অর্থ আগমনী তাওয়াফ। মক্কার বহিরাগত হাজীগণ মক্কায় প্রবেশ করে প্রথমে বায়তুল্লায় গিয়ে যে তাওয়াফ করেন, তা তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ নামে পরিচিত। তাওয়াফে কুদুম আদায় করা সুন্নাত। মক্কায় বসবাসকারী হাজীদের তাওয়াফে কুদুম করার প্রয়োজন নেই। কারণ তারা মক্কাতেই থাকেন। যে কোনো সময় ইচ্ছা করলেই তাওয়াফ করতে পারেন। আর যারা ওমরাহ করবে, তাদেরও আলাদা করে তাওয়াফে কুদুম করার প্রয়োজন নেই। কেননা ওমরাহর তাওয়াফ, তাওয়াফে কুদুমের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য হয়।

যখন কাবা শরিফ দৃষ্টিগোচর হবে, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। কোনো মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে যদি সম্ভব হয়, তাহলে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সম্ভব না হলে, হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়বে। আর প্রতি চক্কর দেওয়ার সময় এভাবে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবে বা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে ও রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর ওপর দরুদ পাঠ করবে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নাত। আর কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করতে হয়। প্রথম তিন চক্কর দেওয়ার সময় রমল করতে হয়। রমল অর্থ বীরদর্পে দুই কাঁধ দুলিয়ে দ্রুত চলা। রমলের সময় ভিড়ের ভেতর পড়ে গেলে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার যখন ফাঁকা

পাবে, তখন রমল করবে। অবশিষ্ট চার চক্কর স্বাভাবিক অবস্থায় চলতে হয়। তাওয়াফের সময় পুরুষের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখতে হয়। একে ইজতিবা বলে। তাওয়াফের প্রতি চক্করে রুকনে ইয়ামিনি স্পর্শ করা মুস্তাহাব। তাওয়াফ শেষে যমযম কূপের পানি পান করা মুস্তাহাব। বায়তুল্লাহমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলে পানি পান করা ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা উত্তম।

মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায়

রাসুলুল্লাহ (সা.) কাবা শরিফে সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহিমের পিছনে দু'রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। (বুখারি) তাওয়াফ নফল হলেও দু রাকাআত সালাত আদায় করা ওয়াজিব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন 'তাওয়াফকারী যেন প্রতি সাত চক্করের পর দু'রাকাআত নামায আদায় করে।' (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা) মাকামে ইবরাহিমের যত নিকটবর্তী স্থানে সালাত আদায় করা যায়, ততই ভালো। ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে, হারাম শরিফের যে কোনো স্থানে নামায আদায় করা যায়। মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায় করে দোয়া করা উত্তম।

সাঈ

সাঈ অর্থ দৌড়াদৌড়ি করা, দ্রুত চলা, পথ অতিক্রম করা। তাওয়াফে বিদা আদায় করে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করতে হয়। সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে সাঈ শেষ করতে হয়। যখন সাফা পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে আর রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর ওপর দরুদপাঠ করবে ও উভয় হাত উপরে উঠিয়ে দোয়া করবে। বাতনুল ওয়াদি, যা বর্তমানে সবুজ রং দ্বারা চিহ্নিত করা আছে, সেখানে দৌড়াতে হবে। ভিড়ের কারণে দৌড়ানো সম্ভব না হলে দ্রুত হাঁটতে হবে। তবে নারীরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে পথ অতিক্রম করবে। সাঈ করা ওয়াজিব।

নফল তাওয়াফ

এ সময় যতবার ইচ্ছা নফল তাওয়াফ করা যায়। কিন্তু ইসলামি শরিয়তে নফল সাঈ করার বিধান নেই। প্রতিবার নফল তাওয়াফ করে, মাকামে ইবরাহিমে দুই রাকাআত সালাত আদায় করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) নফল তাওয়াফের ফযিলত সম্পর্কে বলেন, 'তাওয়াফের প্রতি কদমে আল্লাহ তা'আলা তাওয়াফকারীর একটি গুনাহ মাফ করেন, একটি সাওয়াব লেখেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন'। (মুসনাদে আহমদ)

৭ই যিলহজ

যিলহজ মাসের সাত তারিখ যোহরের সালাতের পর হাজীগণের করণীয় সম্পর্কে ইমাম খুতবা দেন। হাজীদের উচিৎ তা যথাযথ ভাবে শুনে সে অনুযায়ী আমল করা।

৮ই যিলহজ

যিলহজের আট তারিখ সূর্যোদয়ের পর যোহর সালাতের আগে হাজীগণ মিনায় যাবেন। তবে যারা হজে তামাত্তু আদায় করবে, অর্থাৎ প্রথমে ওমরাহ আদায় করে ইহরাম খুলে ফেলেছে তারা এ দিন ইহরাম বাঁধবে। সুন্নাত অনুযায়ী গোসল করে ইহরামের চাদর পরিধান করে বায়তুল্লায় আসবে ও সেখানে ইহরাম বাঁধবে। তাদের জন্য

মসজিদুল হারামে ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। তবে হারাম শরিফের অভ্যন্তরে যে কোনো জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে। মিনায় যাওয়ার সময় তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। সেখানে আট তারিখ যোহর থেকে নয় তারিখ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা সুন্নাত।

৯ই যিলহজ

৯ই যিলহজ ফজরের নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের পর আরাফার ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে ও সেখানে অবস্থান করবে। কেউ যদি মিনায় না যেয়ে থাকে, তাহলে সে সরাসরি আরাফা অভিমুখে রওনা হবে। তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর সুন্নাত অনুসরণ না করার কারণে তার কাজটি মন্দ কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। আরাফার মাঠে অন্য লোকদের সাথে অবস্থান করবে। আলাদা অবস্থান করবে না, কেননা তা অহংকার প্রকাশ করে। আর জামাতের সাথে দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়লে, ইমাম লোকদের নিয়ে এক আজান ও দুই ইকামতে যোহর ও আসরের সালাত যোহরের ওয়াক্তে একসাথে আদায় করবেন। আর যোহর ও আসরের মাঝে কোনো নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ। তাই নফল সালাত আদায় করা যাবে না। সালাত আদায়ের পূর্বে ইমাম খুতবা পাঠ করবেন। খুতবায় তিনি হজের বিধিনিষেধ বর্ণনা করবেন ও মুসলিম উম্মাহর সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করবেন। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির ওপর গুরুত্বারোপ করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিবেন। এরপর সবাইকে সাথে নিয়ে ইমাম দোয়া করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরাফার ময়দানে দু'হাত প্রসারিত করে দোয়া করতেন। আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। যে আরাফার ময়দানে ইহরাম বেঁধে অবস্থান করলো, সে হজ পেলো। যদি কোনো কারণে নয় তারিখ যোহরের সময় আরাফায় উপস্থিত হতে না পারে তাহলে নয় তারিখ দিবাগত রাতে বা সুবহে সাদিকের পূর্বে কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে হজ আদায় হবে। নতুবা হজ বাতিল হয়ে যাবে। আরাফার ময়দানে অবস্থানের সময় যথাসম্ভব জাবালে রহমতের নিকট কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করবে। আর বাতনে উরানা থেকে দূরে থাকবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আরাফার সব স্থানই অবস্থানস্থল। তবে বাতনে উরানা থেকে তোমরা উঠে যাও।' (মুয়াত্তা মালেক)

সূর্যাস্তের পর হাজীগণ মুযদালিফায় ফিরে আসবে ও রাত অতিবাহিত করবে। যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানা ত্যাগ করে, তাহলে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। তবে ভিড় এড়ানোর জন্য সূর্যাস্তের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অসুবিধা নেই। মুযদালিফায় পৌঁছে ইমাম এক আজানে এক ইকামতে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করবেন। তখনও দুই সালাতের মাঝে নফল আদায় করা যাবে না। কেউ আরাফায় মাগরিব আদায় করলে, সুবহে সাদিকের পূর্বে পুনরায় মাগরিব আদায় করে নিবে। ওয়াদিয়ে মুহাসসার ব্যতীত মুযদালিফার যে কোনো জায়গায় অবস্থান করতে পারবে।

১০ই যিলহজ

মুযদালিফায় রাত কাটিয়ে ফজরের ওয়াক্তের প্রথম সময়ে অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতে হয়। তারপর ইমাম সবাইকে নিয়ে দোয়া করবেন। চারদিকে ফর্সা হয়ে গেলে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে

রওনা হতে হয়। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিছুক্ষণ মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। সমগ্র মুযদালিফায় যে কোনো স্থানে অবস্থান করা জায়েয ওয়াদিয়ে মুহাসসার নামক স্থান ব্যতীত। মিনায় শয়তানের প্রতিকৃতি হিসাবে তিনটি স্তম্ভ আছে। মিনায় পৌঁছে এ দিন শুধু জামরাতুল আকাবা বা বড় শয়তানকে উদ্দেশ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। মুযদালিফা থেকে জামরাতে পাথর নিক্ষেপের জন্য ৭০টি পাথর কুড়িয়ে আনা মুস্তাহাব। পাথরগুলো ছোলা পরিমাণ বড় হতে হয়, যাতে অন্যকে আঘাত না করে। পাথর নিক্ষেপের পর কুরবানি করবে। যারা শুধু হজ করবেন, তাদের জন্য কুরবানি করা মুস্তাহাব। যারা হজ ও ওমরাহ আদায় করবেন তাদের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ কুরবানি ওয়াজিব। কুরবানি করার পর মাথা মুন্ডন করে ইহরাম খুলে ফেলতে হয়। মাথা মুন্ডন করা উত্তম। তবে মাথা মুন্ডন না করে শুধু চুল কাটলেও হবে। চুল কাটার নিয়ম হলো অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটবে। মেয়েদের চুলের অগ্রভাগ থেকে কিছুটা কাটতে হয়। তখন থেকে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করতে পারবে ও অন্যসব কিছু করতে পারবে। তবে সম্পূর্ণ হালাল হবে না।

তারপর যিলহজের ১০, ১১, ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে যে কোনো একদিন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে হয়। এটি তাওয়াফে যিয়ারত নামে পরিচিত। তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা ফরয। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পর তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা মাকরুহ। কেউ বিলম্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে, তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে, মিনায় ফিরে ১১ ও ১২ তারিখ অবস্থান করবে। এ দিনগুলোতে মিনায় অবস্থান না করা মাকরুহ।

১১ ও ১২ যিলহজ প্রতিদিন দুপুরের পর মিনার প্রতিটি স্তম্ভে ৭ টি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করবে। পাথর নিক্ষেপের সময় যেখানে সবাই দাঁড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে আর রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর ওপর দরুদপাঠ করবে ও দোয়া করবে। ১১ যিলহজ মিনার মসজিদুল খায়েফে যোহরের সালাতের পর ইমাম খুতবা দিবেন, সবার খুতবা শোনা উচিত। কেউ ১২ তারিখ পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে চাইলে, মক্কায় ফিরে আসবে। মিনায় থেকে গেলে ১৩ তারিখ দুপুরের পর আবার তিনটি প্রতিটি স্তম্ভে ৭টি করে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করেছিলেন। মিনা থেকে মক্কায় ফেরার সময় আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করা সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) এখানে অবতরণ করেছিলেন।

তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ি তাওয়াফ

বহিরাগত হজ পালনকারী অর্থাৎ যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ আদায় করতে আসেন তাদের জন্য দেশে ফিরে যাওয়ার আগে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ি তাওয়াফ আদায় করা ওয়াজিব। এর মাধ্যমে হজের কার্যাবলি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়। তবে যিলহজ মাসের ১২ তারিখের পর যে কোনো নফল তাওয়াফই বিদায়ি তাওয়াফ হিসেবে আদায় হয়ে যায়। বিদায়ি তাওয়াফ করার পরে কেউ মক্কায় অবস্থান করলে মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় পুনরায় তাওয়াফ করা মুস্তাহাব।

বাড়ির কাজ হজের ধর্মীয়, সামাজিক তাৎপর্য/শিক্ষার একটি তালিকা তৈরি করো। এক্ষেত্রে তুমি তোমার পরিবারের সদস্য, ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারো।	
হজের ধর্মীয় তাৎপর্য	হজের সামাজিক তাৎপর্য
গুনাহ মাফ	মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য

হজের কার্যাবলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

হজ আদায়ের সময় আমরা পবিত্র কাবাঘরসহ আল্লাহর নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করতে পারি। ফলে আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। এছাড়া হজের প্রত্যেকটি কাজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে। চলো সে বিষয়ে জেনে নেই।

ইহরাম বাঁধা

ইহরাম অবস্থায় বান্দা নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে। সবকিছু থেকেও ফকির মিসকিনের মতো সেলাইবিহীন দুটি চাদর পরিধান করে কাবা শরিফে উপস্থিত হয়। সবকিছু থাকলেও সে এই কাপড় ব্যতীত আর কিছুই পরিধান করতে পারে না। ফলে হাজী মৃত্যুর চিন্তা করে। মানুষ মৃত্যুর সময়ও এভাবে সব রেখে দুনিয়া থেকে চলে যাবে। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার হুকুমের কারণে হাজী ইহরাম অবস্থায় অনেক বৈধ বিষয় থেকেও দূরে থাকে, যা তাকে হজ আদায় শেষে অবৈধ বিষয় থেকেও দূরে থাকতে সাহায্য করে। ইহরাম মানুষকে তাওবা করতে অনুপ্রাণিত করে। সে উপলব্ধি করে, পশুপাখিও আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হেরেমে প্রবেশ করলে নিরাপদ থাকে। আমরা যদি আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে যাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের মাফ করবেন।

সাঈ করা

হযরত হাজেরা (আ.) পানির জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। তাই আমরা হযরত হাজেরা (আ.)- এর স্মরণে সাঈ করি। আল্লাহ তা'আলা সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে বলেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৮)

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন

হাজরে আসওয়াদ জান্নাতি পাথর। এটি চুম্বনের মাধ্যমে মানুষের গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর পরিপূর্ণ আনুগত্য। তাইতো হযরত ওমর (রা.) একদিন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় বলেছিলেন, 'আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারো না। আমি মহানবি (সা.)-কে যদি তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে কখনোই চুম্বন করতাম না।' (বুখারি ও মুসলিম)

মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায়

আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বার বার পরীক্ষা করেছেন। প্রতিবারই তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই আল্লাহ ইবরাহিম (আ.)- এর আদর্শ গ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য হযরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর সাথীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪) হযরত ইবরাহিম (আ.) কাবা শরিফ নির্মাণের পর আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাই তাঁর স্মরণে আমাদেরকেও সেখানে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায় প্রসঙ্গে বলেন–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ؕ

অর্থ: 'তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৫) আমরা মাকামে ইবরাহিমে ইখলাসের সাথে দোয়া করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদের দোয়া কবুল করবেন।

আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান

আরাফা ও মুযদালিফায় মুমিন ব্যক্তি যখন লাখ লাখ মুমিনের সাথে একত্রিত হয়, তখন তার মাঝে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। সেখানে সবাই সমান। সবাই একই পোশাকে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে। খোলা মাঠে এভাবে রাত কাটানোর মাধ্যমে হাজীগণের মনে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয়।

শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ

আল্লাহ তা'আলার আদেশে ইবরাহিম (আ.) যখন ঈসমাইল (আ)-কে কুরবানি করতে মিনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শয়তান, হযরত ইবরাহিম (আ), হযরত হাজেরা (আ.) ও হযরত ঈসমাইল (আ.)-কে কুমন্ত্রণা দিতে যায়। কিন্তু প্রত্যেকে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেন। তাদের স্মরণেই আমরা প্রতীকীভাবে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করি। পাথর নিক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা যাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

হজের নিষিদ্ধ কার্যাবলি

ইহরাম বাঁধার পর হাজী আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে। তখন তার ওপর কিছু হালাল কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন সালাত আদায় করার সময় তাকবিরে তাহরিমা বলে সালাত শুরু করলে, সালাত শেষ করা পর্যন্ত অন্য সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। তেমনি ইহরাম বাঁধার পর, হজ শেষে ইহরাম খুলে ফেলার আগ পর্যন্ত কিছু কাজ করা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. অশ্লীল কথা বলা বা অশ্লীল কাজ করা।

২. ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক সকল নিষিদ্ধ কাজ বা পাপাচার, সেগুলো এমনিতেই নিষিদ্ধ। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সে কাজগুলো করা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৩. কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ

অর্থ: '(যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছা করে) তার জন্য অশ্লীল কাজ, পাপাচার ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৭)

৪. কোনো প্রাণি শিকার করা বা অন্যকে শিকার করার জন্য শিকার দেখিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার-জন্তু হত্যা করো না।' (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯৫)

৫. পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা নিষিদ্ধ। তাই পাঞ্জাবি, পায়জামা, মোজা পরা নিষিদ্ধ। তবে কোমরে টাকার ব্যাগ বেঁধে রাখতে অসুবিধা নেই। আর মহিলারা সেলাই করা কাপড়ই পরবে।

৬. পুরুষের জন্য মাথা ও মুখ আবৃত করা নিষিদ্ধ। তাই পাগড়ি ও টুপি পরা নিষিদ্ধ। তবে মহিলারা মাথা ঢেকে রাখবে ও মুখ খোলা রাখবে।
৭. আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা বা আতর সুগন্ধি মিশ্রিত পোশাক পরা। সুগন্ধি সাবানও ব্যবহার করা যাবে না।
৮. তেল ব্যবহার করা।
৯. নখ কাটা, মাথার চুল কাটা বা দাড়ি ছাঁটা। এমনকি পশমও কাটা বা উপড়ানো যাবে না। তবে অনিচ্ছাকৃত কোনো কাজ যেমন, গোসলের সময় বা মাথা চুলকানোর সময় চুল পড়লে কোনো অসুবিধা নেই। তবে হাজীর ইহরাম অবস্থায় চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো অনুচিত।

হজের ত্রুটি ও তা সংশোধনের উপায়

হজ পালনকালে অনিচ্ছাকৃত অনেক ভুলত্রুটি বা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে যেতে পারে। ইসলামি পরিভাষায় একে জিনায়াত বলে। এসব ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্যে কিছু বিষয় আছে অনেক বড়, আবার কিছু বিষয় আছে ছোট। আবার কিছু বিষয় আছে যা একেবারে সাধারণ পর্যায়ের; যার কোনো প্রতিকারের প্রয়োজন নেই।

হজের সময় অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া ত্রুটি বা বিষয়গুলোর গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করে কয়েকটি বিধান রয়েছে। আর তা হলো: দম, বুদনা ও সাদকা। দম একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা জবেহ করা। গরু, মহিষ বা উট হলে তার ৭ ভাগের এক ভাগ দেওয়া।

যদি কেউ হজ বা ওমরার ওয়াজিব আদায়ে ভুল করে ফেলে অথবা ইহরামের নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেলে তবে তাকে দম দিতে হবে। আবার অনেক সময় একাধিক দমও দিতে হয়। কারণ ইহরাম অবস্থায় কিরান হজ পালনকারী হাজী তার ত্রুটির জন্য হজ ও ওমরা উভয়টির নিয়তের কারণে ওমরার আগেই ২টি দম দিতে হয়। কেননা কিরান হজ পালনকারী ব্যক্তি এক ইহরামেই হজ ও ওমরা পালন করেন।

অভিনয়

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি/তোমরা হজের বিভিন্ন কার্যাবলি অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমরা নিশ্চয়ই সবাই জানো যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন হলো আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন বাণী। জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর উপর নাযিল করেছেন। আল কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির মতো তোমরা এই অধ্যায়ে পবিত্র কুরআনের কিছু সূরা ও কয়েকটি হাদিসের বাণী জানবে। তোমাদের উচিত নিয়মিত কুরআন বুঝে পাঠ করা, হাদিসের বাণীগুলো জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। তাহলে চলো আমরা আলোচনা শুরু করি।

কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস। পবিত্র কুরআন মানব জাতির হেদায়াতের জন্য ঐশী গ্রন্থ। হাদিস শরিফ হচ্ছে কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি বিধান এ উৎসদ্বয় থেকেই গৃহীত। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে মানবজীবনের সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নীতিমালার আলোকেই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। তাই ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আল কুরআনের পরিচয়

কুরআন আরবি শব্দ। এর অর্থ পড়া, তিলাওয়াত করা, আবৃত্তি করা। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি। অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত হয় বিধায় কুরআনকে কুরআন বলা হয়।

পরিভাষায় আল কুরআন হলো আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বাণী। এটি জিবরাইল (আ.)- এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। এটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এটি জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস এবং পুণ্যার্জনের অন্যতম উপায়। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যায়নকারী ও সুস্পষ্ট দলিল। আসমান ও জমিনে এর চেয়ে শুদ্ধতম আর কোনো গ্রন্থ নেই। কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ এ গ্রন্থে কখনও হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত এটি অবিকৃত থাকবে। যুগে যুগে আল কুরআনের এ মু'জিযা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ○

অর্থ : 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল হিজর, আয়াত : ০৯) আল কুরআন মর্যাদাপূর্ণ, সম্মানিত ও বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এটি হক বাতিলের পার্থক্যকারী। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াতগ্রন্থ।

আমাদেরকে কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে, মানতে হবে। কারণ কুরআন হচ্ছে আমাদের জীবনবিধান। এটি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের সন্ধান দেয়। মিথ্যা থেকে সত্যকে, অন্যায় থেকে ন্যায়কে পার্থক্য করতে শিখায়। মহান আল্লাহ আমাদের জন্য আল কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। সকল ভাষাভাষী লোক কুরআন মাজিদ পড়তে ও মুখস্থ করতে পারে। ফলে প্রতি বছর অসংখ্য হাফিজে কুরআন তৈরি হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন নাম

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে এর একাধিক নাম রয়েছে। এগুলো আল কুরআনের উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বহন করে। আল-কুরআনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাম হলো:

১। **আল ফুরকান (পার্থক্যকারী) :** আল কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী। পবিত্র কুরআনে মিথ্যা থেকে সত্যকে চেনার মানদণ্ড বিবৃত হয়েছে। তাই একে আল ফুরকান বলা হয়।

২। **আল কিতাব (লিখিত) :** আল কিতাব নামে নামকরণের কারণ হলো, এটা একটি লিখিত গ্রন্থ এবং এটাকে বিশুদ্ধভাবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩। **আয যিকর (উপদেশ, আলোচনা) :** কুরআন মাজিদকে যিকর নামে নামকরণ করার কারণ এতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার জীবন যাপনের বিভিন্ন আদেশ-উপদেশ ও নিষেধসমূহ আলোচনা করেছেন এবং বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

৪। **আত তানযিল (নাযিলকৃত) :** এই কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত তাই এর নাম তানযিল রাখা হয়েছে।

৫। **আল বুরহান :** বুরহান শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। এ গ্রন্থ কাফিরদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল।

৬। **আন নূর :** আন নূর অর্থ জ্যোতি, আলো। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য আলো হবে।

৭। **আশ শিফা :** কুরআন মাজিদ অসুস্থ রোগীদের জন্য শিফা বা আরোগ্যস্বরূপ।

৮। **আল হুদা :** আল হুদা অর্থ পথপ্রদর্শন। কুরআন মাজিদ মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।

৯। **আল মাওয়েজা :** যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্য এটি এটি উপদেশগ্রন্থ।

১০। **আর রহমাহ :** আর রহমাহ অর্থ দয়া, করুণা। কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরুপ।

১১। **আল আজিজ :** আল আজিজ অর্থ পরাক্রমশালী। মহাগ্রন্থ আল কুরআন পরাক্রমশালীগ্রন্থ।

১২। **আল মুবিন :** মুবিন অর্থ সুস্পষ্ট। কুরআন মাজিদে মানবজীবনের সকল দিক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। **আল বাশির :** বাশির অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী। কুরআন মাজিদ মুমিনদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী।

১৪। **আন নাজির :** নাজির অর্থ ভয় প্রদর্শনকারী।

কুরআন মাজিদের বিভিন্ন নামে নামকরণ দ্বারা এর চিরস্থায়ী মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পবিত্র কুরআনের নামসমূহ জানবো ও কুরআন মাজিদ পড়তে শিখবো।

মাক্কি সূরা ও মাদানি সূরা

আমরা আল কুরআনুল কারিমে দুই ধরনের সূরার নাম দেখতে পাই। যথা : মাক্কি ও মাদানি সূরা। অবতরণের সময়কাল বিবেচনায় সূরাসমূহকে এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখন আমরা মাক্কি ও মাদানি সূরার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানবো।

মাক্কি সূরার পরিচয় : রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে যেসকল সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাক্কি সূরা বলে।
মাক্কি সূরার সংখ্যা ৮৬ টি।

মাদানি সূরার পরিচয় : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর যে সকল সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেসকল সূরাকে মাদানি সূরা বলে।
মাদানি সূরার সংখ্যা ২৮টি।

মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য :

১. মাক্কি সূরাসমূহে তাওহিদ ও রিসালাতের আলোচনা প্রধান্য পেয়েছে।

২. এ সূরাগুলোতে কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম তথা আখিরাতের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।

৩. মাক্কি সূরাসমূহে শিরক ও কুফরের পরিচয় বর্ণনা করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৪. এ সূরাগুলোতে মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৫. মাক্কি সূরাসমূহে পূর্ববর্তী মুশরিক ও কাফিরদের হত্যাযজ্ঞের কাহিনী, ইয়াতিমদের সম্পদ হরণ করা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া ইত্যাদি কুপ্রথার বিবরণ রয়েছে।

৬. এর শব্দমালা শক্তিশালী, ভাবগম্ভীর ও অন্তরে প্রকম্পন সৃষ্টিকারী।

৭. এতে শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা উল্লেখ রয়েছে।

৮. এতে প্রসিদ্ধ বিষয়সমূহ শপথের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯. মাক্কি সূরাসমূহ সাধারণত আকারে ছোট এবং আয়াতগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট।

১০. এ সূরাগুলোতে পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণের সফলতা ও তাদের অবাধ্যদের শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে।

১১. মাক্কি সূরাসমূহে 'يَآَيُّهَا النَّاسُ' (অর্থ- 'হে মানবজাতি') কথাটি উল্লেখ আছে।

মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য :

১. মাদানি সূরাসমূহে শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

২. এতে আহলে-কিতাবের পথভ্রষ্টতা ও তাদের কিতাব বিকৃত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. মাদানি সূরাসমূহে নিফাকের পরিচয় ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৪. এ সূরাগুলোতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।

৫. এতে পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়সহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

৬. মাদানি সূরাসমূহের আয়াতসমূহ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ।

৭. এ সূরাগুলোতে ইবাদতের রীতিনীতি, সালাত, সাওম, হজ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. মাদানি সূরাসমূহে ইহুদি ও খ্রীস্টানদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

৯. মাদানি সূরাসমূহে বিচারব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. মাদানি সূরাসমূহে 'يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا' (অর্থ- 'হে ঈমানদারগণ') কথাটি উল্লেখ আছে।

১১. হালাল ও হারাম সংক্রান্ত বর্ণনা প্রধান্য পেয়েছে।

দলগত কাজ:

শিক্ষার্থীরা মাক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

আল কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

কুরআন মাজিদ বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়াতের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এই কুরআনের রয়েছে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য, যার কারণে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা এখন আল কুরআনের সেই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যসমূহ জানবো, যার মাধ্যমে এর মাহাত্ম্যও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পূর্বযুগের বিভিন্ন উম্মত তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানি কিতাব এবং তাদের নবির শিক্ষা নিজেদের সুবিধামতো পরিবর্তন করে নানারকম বিকৃতি ঘটিয়েছে। আল কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতি ও ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত। এটিকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থারূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানব জাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যে সব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দেবে, তার সবকিছুরই মূলনীতি কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ। (সুরা আন-নাহল, আয়াত : ৮৯)

কুরআন নাযিল হওয়ার সময় থেকে অদ্যাবধি অনেকেই একে মানুষের রচনা, কবিতা, যাদু ইত্যাদি বলে অপবাদ দিয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে এমন ধারণা জন্ম নেবে, তাদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন 'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এটার অনুরূপ কোনো সূরা নিয়ে আস এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর'। (সুরা আল বাকারা, আয়াত: ৪৩) কুরআনের এটা একটি বড় মু'জিযা, আজ পর্যন্ত কোনো মানুষই কুরআনের অনুরূপ কিছুই রচনা করতে পারেনি। সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে- 'না, এটা কোনো মানুষের বাণী নয়।'

আল কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান সম্বলিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এরপর আর কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না এবং প্রয়োজনও হবে না। এর আগে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এ তিনটি বড় আসমানি কিতাব এবং ১০০ খানা সহিফা বিভিন্ন নবি-রাসুলের উপর নাযিল হয়েছিল। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তার কোনোটিই এখন আর অবিকৃত অবস্থায় বলবৎ নেই। তবে কুরআন মাজিদ সেসকল কিতাব নাযিল হওয়াকে সত্যায়ন করছে এবং উক্ত কিতাবসমূহের মৌলিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে ধারণ করছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস হলো আল-কুরআন। এ মহাগ্রন্থে ব্যাকরণ, আইন, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ফারাইজ (সম্পদ বণ্টনশাস্ত্র), বর্ষপঞ্জীসহ জীবনঘনিষ্ঠ সব প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। মহাকাশবিজ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আর তারা (গ্রহ-নক্ষত্র) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে।' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৪০)।

আল-কুরআনের তিলাওয়াত ব্যক্তির হৃদয় প্রশান্ত ও তৃপ্ত করে। যতবার তিলাওয়াত করা হয় প্রতিবারই এর তিলাওয়াত ব্যক্তিকে নতুন চেতনায় ও কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ইসলামের শত্রু ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বোন ফাতিমার কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে এতটাই বিগলিত হন যে, সাথে সাথে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে ছুটে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল কুরআন মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ: 'আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।' (সূরা আল-আনআম, আয়াত : ৩৮)

কুরআনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য যত বিস্তৃতভাবে এবং যত গভীরভাবে জানা যায় তত ঈমান বাড়ে, কুরআনের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে এবং আমল করার আগ্রহ তৈরি হয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা! চল, আমরা বেশি বেশি কুরআন অধ্যয়ন করি এবং তার আলোকে জীবন গড়ি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআনের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

'কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা আমি/আমরা কীভাবে অনুশীলন করতে পারি'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা দলে/প্যানেলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

তাজবিদ

তাজবিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘সুন্দর করা’। কুরআনের হরফগুলো সুন্দর করে পাঠ করা। ইসলামি পরিভাষায় তাজবিদ হচ্ছে কুরআন মাজিদের প্রতিটি হরফকে তার মূল মাখরাজ ও সিফাত থেকে আদায় করা। গুন্নাহ, পোর-বারিক, মাদ্দসহ অন্যান্য নিয়ম কানুন যথাযথভাবে পালন করে কুরআন তিলাওয়াত করাকে তাজবিদ বলে।

তাজবিদসহকারে কুরআন পাঠ করা ওয়াজিব। কারণ কুরআন মাজিদ যদি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা না হয়, তাহলে এর অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাজবিদসহ তিলাওয়াত সম্পর্কে বলেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ : ‘কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।’ (সুরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত : ০৪)

এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ পাঠ করা, যেকোনো হরফকে বাড়িয়ে পড়া, যেকোনো হরফকে কমিয়ে পড়া এবং যের, যবর, পেশকে পরিবর্তন করে পাঠ করা মারাত্মক ভুল। এ ধরনের ভুলের জন্য সালাত ভঙ্গ হয়।

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন না পড়লে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং নামায শুদ্ধ হবে না। অন্যদিকে সহিহ শুদ্ধভাবে কুরআন পড়লে বান্দা প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে এবং কিয়ামতের দিন এটি বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। হাদিসে এসেছে–

اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّأَصْحَابِهِ

অর্থ : ‘তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা নিশ্চয়ই তা স্বীয় পাঠকের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।’ (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার কিতাব থেকে একটি হরফ পড়বে, সে একটি নেকি পাবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ দেওয়া হবে। আমি বলি না الم একটি হরফ বরং ا একটি হরফ, ل একটি হরফ এবং م একটি হরফ।’ (তিরমিযি)

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা ও অর্থ বুঝা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদাত। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত ও শিক্ষাদান করাকে রাসুল (সা.) মর্যাদাপূর্ণ আমল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ : ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়। (বুখারি)

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা তাজবিদের বেশকিছু নিয়ম সম্পর্কে জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা নুন সাকিন ও

তানবীনের কায়েদা ও মিম সাকিনের কায়েদা সম্পর্কে জানব।

নুন সাকিন ও তানবীনের বর্ণনা

যে নুন (ن) এর ওপর সাকিন (ـْ) হয় এবং তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একসাথে উচ্চারিত হয়, তাকে নুন সাকিন (نْ) বলে । নুন সাকিন আলাদাভাবে উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন নুন সাকিন (نْ) মিমের সাথে মিলে মিন (مِنْ) হলো ।

দুই যবর (ـً) দুই যের (ـٍ) এবং দুই পেশ (ـٌ) যখন কোনো হরফের ওপর বা নিচে ব্যবহার হয় তখন তাকে তানবীন বলে।

তানবীন অন্য হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। যেমন- (بً), (بٍ), (بٌ) প্রকৃত রূপ (بَنْ) (بِنْ) (بُنْ)

নুন সাকিন ও তানবীন পড়ার নিয়ম: নুন সাকিন ও তানবীন পড়ার নিয়ম চারটি। যথা:

১. ইযহার (إِظْهَارٌ)
২. ইকলাব (إِقْلَابٌ)
৩. ইদগাম (إِدْغَامٌ)
৪. ইখফা (إِخْفَاءٌ)

নিম্নে আমরা এগুলোর নিয়ম সম্পর্কে উদাহরণসহ জানব।

১. ইযহার (إِظْهَارٌ) : ইযহার এর শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট করা, প্রদর্শন করা ।

পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, নুন সাকিন ও তানবীনের পর হুরুফে হালকির ছয়টি হরফের যে কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে হয়।

ইযহারের হরফ ছয়টি। যথা: ء ه ح ع خ غ এগুলোকে হুরুফে হালকিও বলা হয়। উদাহরণ:

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مَنْ عَلِمَ	عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
نْ + ع এখানে নুন সাকিনের পর ع এসেছে।	ـٌ + ح এখানে তানবীনের পর ح এসেছে।
مَنْ اٰمَنَ	كُفُوًا أَحَدٌ

২. ইকলাব (إِقْلَابٌ) : ইকলাব এর শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন করা। ইকলাবের হরফ হলো বা (ب)। নুন সাকিন ও তানবীনের পর (ب) হরফটি আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে গুন্নাহর সাথে পাঠ করাকে ইকলাব বলে। যেমন:

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مِنْ بَعْدِى	إِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ
نْ + ب এখানে নুন সাকিনের পর ب এসেছে।	ـٌ + ب এখানে তানবীনের পর ب এসেছে।

৩. ইদগাম (إِدْغَامٌ) : ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া, একত্র করা। ইদগামের হরফ ছয়টি যথা (ي ر م ل و ن) একত্রে এটিকে ইয়ারমালুন (يَرْمَلُوْنَ) বলে। তাজবিদশাস্ত্র অনুসারে, নুন সাকিন ও তানবীনের পর ইদগামের ছয়টি হরফ থেকে যে কোনো একটি হরফ থাকলে নুন সাকিন ও তানবীনের সাথে ঐ হরফকে একত্র করে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলা হয়।

ইদগামের ফলে নুন সাকিন বা তানবীনের পরবর্তী হরফটি তাশদিদ (ـّ) যুক্ত হয়।

ইদগামের প্রকারভেদ : ইদগাম দুই প্রকার: যথা:

(ক) গুন্নাহসহ ইদগাম : নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের ৪টি হরফের (ي و ن م) যে কোনো একটি আসলে ঐ নুন সাকিন ও তানবীনকে তার পরবর্তী অক্ষরের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে গুন্নাহসহ ইদগাম বলে। এর অপর নাম ইদগাম নাকিস। যেমন:

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مَنْ يَّقُوْلُ	قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ،
نْ + ي এখানে নুন সাকিনের পর ي এসেছে।	ـٌ + م এখানে তানবীনের পর م এসেছে।
مِنْ وَّالٍ، وَإِنْ نَّكَثُوْا	بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

এখানে নুন সাকিন ও তানবীন এর পর ইয়া (ي), মিম (م), নুন (ن) এবং ওয়া (و) হরফ আসায় নুন সাকিন ও তানবীনকে ইয়া, মিম, নুন ও ওয়া এর সাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

(খ) গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম : নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের দুটি হরফের (ر ل) যে কোনো একটি আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে তার পরবর্তী অক্ষরের সাথে গুন্নাহ ছাড়া

মিলিয়ে পাঠ করাকে গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম বলে। এর অপর নাম ইদগাম কামিল। যেমন :

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مِن رَّبِّكَ	غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
نْ + ر এখানে নুন সাকিনের পর ر এসেছে।	ـٌ + ر এখানে তানবীনের পর ر এসেছে।

উপরের উদাহরণ দু'টিতে নুন সাকিন ও তানবীনের পরে রা (ر) এবং লাম (ل) এসেছে। এক্ষেত্রে নুন সাকিন ও তানবীনকে এদের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। তবে গুন্নাহ করা যাবে না।

উল্লেখ্য নুন সাকিন ও তানবীনের ইদগাম হওয়ার জন্য নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ভিন্ন শব্দের শুরুতে ইদগামের হরফ থাকতে হবে। একই শব্দে নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের হরফ থাকলে ইদগাম হয় না।

যেমন : (دُنْيَا، بُنْيَانٌ، صِنْوَانٌ، قِنْوَانٌ)

উপরের উদাহরণগুলোতে নুন সাকিন ও তানবীনের পর একই শব্দে ওয়াও ও ইয়া এসেছে তাই ইদগাম হবে না।

৪. ইখফা (إِخْفَاءٌ) : ইখফা অর্থ গোপন করা, পরিভাষায় নুন সাকিন ও তানবীনের পর ইখফার হরফের যে কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে নাসিকা সংযোগে গোপন করে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে ইখফা বলা হয়।

ইখফার হরফ ১৫টি। যথা : ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
لَنْ تَفْعَلُوْا	خَيْرًا كَثِيْرًا
نْ + ت এখানে নুন সাকিনের পর ت এসেছে।	ـً + ك এখানে তানবীনের পর ك এসেছে।
مِنْ جُوْعٍ	مَكَانًا سُوًى

আমরা নুন সাকিন ও তানবীন এর নিয়মগুলো জানবো, শিখবো এবং নিয়মগুলো মেনে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করবো।

দলগত কাজ :

শিক্ষার্থীরা নুন সাকিন ও তানবীনের নিয়ম ব্যবহার করে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তিলাওয়াত শুনে তাদের মূল্যায়ন করবেন।

মিম সাকিন

মিম সাকিন : মিম (م) হরফের উপর সাকিন (ـْ) হলে তাকে মিম সাকিন (مْ) বলে।

মিম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি। যথা:

১. ইখফা (إِخْفَاءٌ)
২. ইদগাম (إِدْغَامٌ)
৩. ইযহার (إِظْهَارٌ)

১. **ইখফা (إِخْفَاءٌ)** : ইখফা অর্থ গোপন করা। (مْ + ب) মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) হরফ আসলে ঐ মিম সাকিনকে গুন্নাহ সহকারে পড়াকে ইখফা বলে।

এ প্রকারের মিম সাকিন উচ্চারণ কালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে সামান্য গুন্নাহ লোপ পায়, মিম হরফটি হালকা উচ্চারিত হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। এ রকম পড়াকে ইখফায়ে শাফাভি বলে।

উদাহরণ : تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

এখানে মিম সাকিনের পর 'ب' অক্ষর থাকায় গুন্নাহসহ পড়তে হবে।

২. **ইদগাম (إِدْغَامٌ)** : ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। (مْ + م) মিম সাকিনের পর যদি হরকতযুক্ত মিম (مْ) থাকে তাহলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম বলে।

এক্ষেত্রে মিম সাকিনের পরের মিমের উপর তাশদিদ থাক বা না থাক, তাশদিদ ধরে গুন্নাহ করে পড়তে হবে।

উদাহরণ: اَلَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ

৩. **ইযহার (إِظْهَارٌ)** : ইযহার অর্থ স্পষ্ট করা । (ب ও م ব্যতীত অন্য হরফ + مْ) মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) এবং 'মিম' (م) ব্যতীত বাকি সাতাশ হরফের কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করাকে মিম সাকিনের ইযহার বলে।

উদাহরণ: لَهُمْ فِيْهَا ، أَلَمْ نَجْعَلْ ، اَلْحَمْدُ

উপরের উদাহরণগুলোতে মিম স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে হবে।

আমরা মিম সাকিন এর নিয়মগুলো জানবো, শিখবো এবং নিয়ম মেনে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করব।

বাড়ির কাজ

তোমরা পাঠ্যপুস্তকে নির্ধারিত সূরাসমূহ বাড়িতে শুদ্ধভাবে অনুশীলন/চর্চা করবে।
(এক্ষেত্রে তুমি তাজবিদের নিয়মগুলো তোমার পরিবারের সদস্যদের অবহিত করতে পারো।)

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআন মাজিদের কয়েকটি সূরা

সূরা আল কাওসার (سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ)

সূরা আল কাওসার আল কুরআনের ১০৮তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৩টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ আল কাওসার থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল কাওসার।

শানে নুযুল

রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহিম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন মক্কার কাফিররা তাঁকে (اَلْأَبْتَرُ) বা নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। তাদের মধ্যে আস ইবনে ওয়ায়েল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আলোচনা হলে সে বলত, আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোনো চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ সে নির্বংশ। তার মৃত্যুর পর তার নাম উচ্চারণ করার মতো কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল কাওসার অবতীর্ণ হয়। (ইবনে কাসির, মাযহারী)

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
إِنَّا	নিশ্চয়ই আমি	وَانْحَرْ	এবং আপনি কুরবানি করুন
اَعْطَيْنٰكَ	আপনাকে দান করেছি	إِنَّ	নিশ্চয়ই

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلْكَوْثَرَ	কাওসার বা সবকিছুর আধিক্য	شَانِئَكَ	আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী
فَصَلِّ	সুতরাং আপনি সালাত আদায় করুন	هُوَ	সে
لِرَبِّكَ	আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে	اَلْأَبْتَرُ	লেজকাটা, নির্বংশ

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝	(১) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝	(২) সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানি করুন।
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝	(৩) নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

ব্যাখ্যা

সূরা কাওসারের শুরুতে মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কাওসার তথা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। কাওসার অর্থ হাউজে কাওসার। হাউজে কাওসার হলো জান্নাতের একটি ঝরনা, যার কিনারা স্বর্ণের, তলদেশ মণি-মুক্তার, যার মাটি মিশক থেকেও সুগন্ধি, যার পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি।

এই মহান পুরস্কারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে দু'টি হলো সালাত ও কুরবানি। পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আবতার বা নির্বংশ বলে গালি দিত। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বেখবর। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কন্যা সন্তানের দিক থেকে হয়। একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

শিক্ষা

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা‘আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও সম্মানিত।

২. কিয়ামতের দিন রাসুল (সা.) হাউজে কাওসারের মালিক হবেন। তিনি তাঁর প্রিয় উম্মতকে এখান থেকে পানি পান করাবেন।

৩. যারা রাসুলের অনুকরণ অনুসরণ করবে না, তারা কাওসারের পানি পান করার সৌভাগ্য লাভ করবে না।

৪. সালাত যেমন শারীরিক ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম, তেমনি কুরবানি আর্থিক ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম।

৫. প্রিয়নবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিরোধিতা করার পরিণাম খুবই মারাত্মক।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সূরা আল কাওসার তিলাওয়াত করবে। এরপর সূরাটির অর্থ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

সূরা আল মা‘উন (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ)

সূরা আল মা‘উন আল কুরআনের ১০৭তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৭টি। এর প্রথম তিন আয়াত মক্কায়, বাকি অংশ মদিনায় অবতীর্ণ। এ সূরার শেষ শব্দ আল মা‘উন (الْمَاعُوْنَ) রয়েছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল মা‘উন।

শানে নুযুল

আবু জাহলের অভিভাবকত্বে একটি ইয়াতিম ছেলে ছিল। যার সাথে সে খারাপ ব্যবহার করত। সূরার প্রথম তিন আয়াত সে সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সূরার চার থেকে ছয় নম্বর আয়াতে যাদের দিকে ইশারা করা হয়েছে, তারা ঐ শ্রেণির মুনাফিক, যাদের অস্তিত্ব মক্কায় ছিল না। মদিনায় আগমনের পর এ ধরনের লোক দেখানো সালাত আদায়কারীদের সন্ধান মিলে। শেষের চার আয়াতে মদিনার মুনাফিকদের লোক দেখানো সালাত আদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
أَرَأَيْتَ	আপনি কি দেখেছেন?	اَلْمِسْكِيْنِ	অভাবগ্রস্ত
أَلَّذِيْ	তাকে	فَوَيْلٌ	সুতরাং দুর্ভোগ
يُكَذِّبُ	সে অস্বীকার করে/মিথ্যা প্রতিপন্ন করে	لِّلْمُصَلِّيْنَ	সালাত আদায়কারীদের জন্য
بِالدِّيْنِ	দ্বীন বা প্রতিদান দিবস	أَلَّذِيْنَ	যারা
فَذٰلِكَ	সে তো সে-ই	هُمْ	তারা
يَدُعُّ	সে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়	عَنْ صَلَاتِهِمْ	তাদের সালাত সম্বন্ধে
الْيَتِيْمَ	ইয়াতিম	سَاهُوْنَ	উদাসীন
وَلَا يَحُضُّ	এবং সে উৎসাহ দেয় না	يُرَآءُوْنَ	তারা দেখায়
عَلٰى	ওপর	وَيَمْنَعُوْنَ	এবং তারা বিরত থাকে।
طَعَامِ	খাদ্য	اَلْمَاعُوْنَ	গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিস

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	**দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।**
أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝	(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে?
فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝	(২) সে তো সে-ই, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝	(৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝	(৪) সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝	(৫) যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝	(৬) যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝	(৭) এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

ব্যাখ্যা

এ সূরার শুরুতে প্রশ্নবোধক শব্দ প্রয়োগ করে পরবর্তী অংশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'আপনি কি দেখেছেন তাকে যে দ্বীন তথা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করছে?' এ সূরায় নিকৃষ্ট দু'টি শ্রেণি তথা কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় মন্দ স্বভাব উল্লেখ করে তার পরিণতিস্বরূপ জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

কাফিররা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে। বিশেষত এখানে আস ইবনে ওয়ায়েলকে বুঝানো হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি বিচার দিবসকে অস্বীকার করে না। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। কাফিরেরা ইয়াতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মিসকিনকে খাদ্য দিতো না এবং অপরকে খাদ্য দিতে উৎসাহ দিতো না।

দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে কপটচারী মুনাফিক সম্প্রদায় বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। এ সূরার দ্বিতীয় অংশে তাদের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। তারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করতো যাকাত দিত না, নিত্য ব্যবহার্য ছোটখাট জিনিসপত্র দিয়ে কাউকে সাহায্য করতো না। এসব কাজ স্বভাবতই নিন্দনীয় এবং ভয়াবহ গুনাহের। যদি কেউ কুফরবশত এসব কাজ করে, তবে তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

শিক্ষা

১. প্রতিদান দিবস বা বিচার দিবসকে অস্বীকার করা জঘন্য অপরাধ, এটা মুমিনের কাজ হতে পারে না বরং এটা কাফির ও মুনাফিকদের কাজ।

২. ইয়াতিম ও অসহায় দুঃস্থদের তাড়িয়ে না দিয়ে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৩. ইয়াতিম ও অসহায় দুঃস্থদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করা।

৪. সালাতে অলসতা করা যাবে না।

৫. লোক দেখানো সালাত আদায় করা যাবে না।

৬. সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ পরিণতি।

৭. নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ধার দেওয়াতে কৃপণতা করা যাবে না।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা আল মাউন এর আলোকে ব্যক্তিগত জীবনে করণীয় লিখে একটি রঙ্গিন পোস্টার তৈরি করবে।

সূরা কুরাইশ (سُوْرَةُ قُرَيْشٍ)

সূরা কুরাইশ আল কুরআনের ১০৬তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ কুরাইশ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা কুরাইশ।

শানে নুযুল

মক্কা নগরীতে পবিত্র কা'বা ঘর অবস্থিত। কুরাইশরা এ গৃহের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করত। তারা ছিল ব্যবসায়ী। তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও শীতকালে ইয়েমেনে গমন করত। আর পবিত্র কা'বা গৃহের পরিচর্যার দায়িত্ব পালনের কারণেই তারা ইয়েমেন ও সিরিয়ায় নিরাপদে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারত। আবরাহার আক্রমণ থেকেও তারা রক্ষা পেয়েছিল। এ সমস্ত নিয়ামত তারা পেয়েছিল শুধুমাত্র কা'বা গৃহের সাথে থাকতো বলেই। তাই তাদের এই নিয়ামতের উল্লেখপূর্বক এই ঘরের প্রভু তথা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করার আহবান করে এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
لِاِيْلٰفِ	যেহেতু আসক্তি আছে	هٰذَا	এই
قُرَيْشٍ	কুরাইশের	الْبَيْتِ	গৃহ
اِلٰفِهِمْ	আসক্তি আছে তাদের	الَّذِيْ	যিনি
رِحْلَةَ	সফর	أَطْعَمَهُمْ	তাদেরকে আহার দিয়েছেন
الشِّتَآءِ	শীত	مِنْ	হতে
الصَّيْفِ	গ্রীষ্ম	جُوْعٍ	ক্ষুধা
فَلْيَعْبُدُوْا	অতএব, তারা ইবাদাত করুক	اٰمَنَهُمْ	তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।
رَبَّ	মালিক	خَوْفٍ	ভীতি

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ۝	(১) যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে,
اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ۝	(২) আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ۝	(৩) অতএব, তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের মালিকের,
الَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝	(৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

ব্যাখ্যা

মক্কা ছিল একটি অনুর্বর মরুঅঞ্চল। সেখানে চাষাবাদ হতো না। এমন বাগবাগিচাও ছিলো না, যা থেকে ফল ফলাদি পাওয়া যেতে পারে। সেখানে খাদ্য-সামগ্রী বাইরে থেকে আনা হতো। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কুরাইশরা বিদেশ সফর করত। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করতো। এর ওপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। কুরাইশরা কাবার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। ফলে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিল। তাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে কেউই বাঁধা দিত না। দস্যু ও শত্রুদের আক্রমণের ভীতি হতে তারা নিরাপদ ছিল। আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ উল্লেখপূর্বক তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন।

কুরাইশদের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের সাতটি বিষয়ে মর্যাদা দান করেছেন;

(১) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল (সা.) তাদের মধ্য হতে এসেছেন;

(২) নবুওয়াত তাদের মধ্য হতে এসেছে;

(৩) কাবাগৃহের তত্ত্বাবধান;

(৪) হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন;

(৫) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হস্তীবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন;

(৬) উক্ত ঘটনার পর কুরাইশরা দশবছর যাবত আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো ইবাদাত করেনি;

(৭) আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়ে কুরআনে পৃথক একটি সূরা নাযিল করেছেন যাতে তারা ছাড়া আর কারো আলোচনা করা হয়নি।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়িক সফরে কুরাইশদের নিরাপত্তা দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিরাপত্তা প্রদানের মালিক আল্লাহ।

২. আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করলে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

৩. আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দান করেছেন।

৪. প্রাপ্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

৫. মহান আল্লাহর ইবাদাত করা।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা কুরাইশ শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে। এরপর পরস্পরের মধ্যে এ সূরাটির শিক্ষা আলোচনা করবে।

সূরা আল কারি‘আহ (سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ)

সূরা আল কারি‘আহ কুরআনের ১০১তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ১১টি। এ সূরার প্রথম শব্দ আল কারি‘আহ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল কারি‘আহ। قَرْعٌ শব্দটির অর্থ সজোরে আঘাত করা যাতে ভীষণ শব্দ হয় এবং যে সজোরে আঘাত করে তাকে قَارِعٌ বলা হয়। এখানে এই শব্দটির অর্থ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

শানে নুযুল

কাফিরদের স্বভাব ছিল পরকালকে অস্বীকার করা। মক্কার কাফির মুশরিকদের কিয়ামত দিবস ও পরকালীন জবাবদিহিতা অস্বীকারের পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلْقَارِعَةُ	মহাপ্রলয়	ثَقُلَتْ	ভারী হবে
وَمَآ أَدْرَاكَ	এবং আপনি কী জানেন?	مَوَازِيْنُهُ	পাল্লা
يَوْمَ	সেই দিন	فَهُوَ	অতঃপর সে
يَكُوْنُ	হবে	فِيْ	মধ্যে
النَّاسُ	মানুষ	عِيْشَةٍ	জীবন
كَالْفَرَاشِ	পতঙ্গের মতো	رَاضِيَةٍ	সন্তোষজনক
الْمَبْثُوْثِ	বিক্ষিপ্ত	خَفَّتْ	হালকা হবে

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
وَتَكُوْنُ	এবং হবে	فَأُمُّهٗ	তার স্থান
الْجِبَالُ	পর্বতসমূহ	هَاوِيَةٌ	হাবিয়া নামক জাহান্নাম
كَالْعِهْنِ	রঙিন পশমের মতো	مَا هِيَهْ	সেটা কী
الْمَنْفُوْشِ	ধূনিত	نَارٌ	অগ্নি
فَأَمَّا	তখন	حَامِيَةٌ	অতি উত্তপ্ত

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اَلْقَارِعَةُ ۝	(১) মহাপ্রলয়,
مَا الْقَارِعَةُ ۝	(২) মহাপ্রলয় কী?
وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝	(৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝	(৪) সেই দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো,
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝	(৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মতো।
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝	(৬) তখন যার পাল্লা ভারি হবে,
فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝	(৭) সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝	(৮) কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে,

فَأُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۟	(৯) তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।
وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۟	(১০) আপনি কি জানেন সেটা কী?
نَارٌ حَامِيَةٌ ۟	(১১) সেটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ামত দিবসে আসমানসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হবে। পৃথিবী প্রকম্পিত হবে। পাহাড়সমূহ তুলার মতো উড়তে থাকবে। তারকাসমূহ খসে পড়বে। চন্দ্র ও সূর্য তাদের আলো হারিয়ে ফেলবে। ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুৎকারে সকল মানুষ তাদের স্ব স্ব কবর থেকে বিচার দিবসের ময়দানে একত্রিত হবে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই স্রোতের ন্যায় জড়ো হতে থাকবে। সেদিন পাহাড়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হবে। টুকরো টুকরো হয়ে মহাশূন্যে উড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমল পরিমাপের জন্য মিজানের পাল্লা প্রস্তুত করবেন। মুমিনদের মধ্যে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য আমল পরিমাপ করা হবে। যার নেক আমলের ওজন বদ আমল থেকে ভারি হবে, সে আনন্দময় জীবন লাভ করবে। আর যার হালকা হবে তার আবাসস্থল হবে হাবিয়া নামক জাহান্নাম। যার আগুনের তীব্রতা হবে কঠিন ও ভয়াবহ।

শিক্ষা

১. পৃথিবী ও পৃথিবীর জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী।

২. আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীর সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন এবং মহাপ্রলয়ের মাধমে তিনিই সবকিছু ধ্বংস করবেন।

৩. ইখলাসের সাথে করা আমল মিজানের পাল্লায় ভারি হবে, অপরদিকে ইখলাসবিহীন আমল হালকা হবে।

৪. কিয়ামতের মাঠে মানুষের আমলের হিসাব নেওয়া হবে।

৫. বদ আমল জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা আল কারি'আহ শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে। এরপর পরস্পরের মধ্যে এ সূরাটির শিক্ষা আলোচনা করবে।

সূরা যিলযাল (سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ)

সূরা আল যিলযাল আল কুরআনের ৯৯তম সূরা। এটি মদিনায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ যিলযাল থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল যিলযাল। রাসুলুল্লাহ (সা.) সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

শানে নুযুল

কাফিরদের অভ্যাস ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে পরকাল ও কিয়ামত দিবসের সময় সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করা। পবিত্র কুরআন মাজিদের বিভিন্ন সূরায় একথা এসেছে। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা দিয়ে এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

সেসময় দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন সামান্য পরিমাণ দান করাকে তুচ্ছ মনে করে বিরত থাকতো। অপরজন মিথ্যা বলা, গীবত করা ও কুদৃষ্টি ইত্যাদি গুনাহসমূহকে হালকা মনে করতো। সে ভাবত কবিরাগুনাহের জন্য কেবল জাহান্নামের শাস্তি হবে। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে শেষের দুই আয়াত নাযিল হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
إِذَا	যখন	أَوْحٰى	আদেশ করবেন
زُلْزِلَتِ	প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে	يَصْدُرُ	বের হবে, প্রকাশিত হবে
اَلْأَرْضُ	পৃথিবী, জমিন, মাটি	اَشْتَاتًا	ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পৃথক পৃথক ভাবে
وَأَخْرَجَتْ	এবং বের করে দেবে	لِّيُرَوْا	যাতে তাদেরকে দেখানো যায়
أَثْقَالَ	বোঝাসমূহ	أَعْمَالَهُمْ	তাদের কৃতকর্ম
وَقَالَ	এবং সে বলবে	فَمَنْ	অতপর সে
اَلْإِنْسَانُ	মানুষ	يَعْمَلْ	কাজ করবে
مَا لَهَا	এর কী হল?	مِثْقَالَ	পরিমাণ
يَوْمَئِذٍ	সে দিন	ذَرَّةٍ	অণু

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
تُحَدِّثُ	বর্ণনা করবে	خَيْرًا	সৎকর্ম
أَخْبَارَ	সংবাদসমূহ	يَرَهُ	তা দেখবে
رَبَّكَ	তোমার প্রতিপালক	شَرًّا	অসৎকর্ম

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝	(১) পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝	(২) এবং পৃথিবী যখন তার অভ্যন্তরস্থ ভার বের করে দেবে,
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝	(৩) এবং মানুষ বলবে,'এর কী হলো?'
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝	(৪) সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحٰى لَهَا ۝	(৫) কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন,
يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝	(৬) সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়,
فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ۝	(৭) কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে
وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ۝	(৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় চমৎকারভাবে কিয়ামত দিবসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী যখন স্বীয় কম্পনে প্রকম্পিত হবে। তখন পৃথিবী তার ভিতরের সবকিছু স্বর্ণ খন্ডের আকারে বের করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এত বড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কান্ড করেছিলাম?

চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমার নিজের হাত হারিয়েছিলাম? তখন কেউ এসব স্বর্ণখন্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না।

জমিন তার ভিতরে যত খনিজ সম্পদ রয়েছে, তা সব বাইরে বের করে দিবে। মানুষ বিস্মিত হয়ে ভয়ে বলতে থাকবে এই জমিনের কী হলো? এত কাঁপছে কেন? ভিতর থেকে সব বের করে দিচ্ছে কেন? সেদিন জমিন আল্লাহর হুকুমে তার ওপর মানুষ যেসব আমল করেছে তার সাক্ষ্য দিবে। কেউ ঈমানের সাথে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে। তাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। কুফর অবস্থায় কৃত সৎকর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং তাকে তার শাস্তি পেতে হবে।

শিক্ষা

১. কিয়ামতের দিন সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।

২. কিয়ামতের দিন জমিন সাক্ষ্য দিবে তার উপর মানুষ কী কী করেছে।

৩. কিয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন দলে তাদের আমলের হিসাব দেওয়ার জন্য বের হবে।

৪. কিয়ামতের দিন মানুষ তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমলসমূহ দেখতে পাবে এবং এর প্রতিদান পাবে।

৫. নেক আমল অণু পরিমাণ হলেও তা পরিহার করা যাবে না। অপরদিকে বদ আমল যত ক্ষুদ্র হোক না কেন তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা যিলযাল শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে। এরপর পরস্পরের মধ্যে এ সূরাটির শিক্ষা আলোচনা করবে।

আয়াতুল কুরসি

আয়াতুল কুরসি কুরআন মাজিদের সর্ববৃহৎ সূরা আল-বাকারার ২৫৫ নং আয়াত। এটি আল-কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। কুরসি শব্দের অর্থ আসন, সিংহাসন, সাম্রাজ্য, মহিমা, জ্ঞান ইত্যাদি। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, পূর্ণ ক্ষমতা, মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করা হয়েছে। এ জন্য এ আয়াতকে আয়াতুল কুরসি বলা হয়।

রাসুল (সা.) আয়াতুল কুরসিকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে অভিহিত করেছেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বাধা থাকে না।' অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও শয়নকালে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযি)

অন্য এক হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব জবাব দিলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসি। রাসুল (সা.) তা সমর্থন করে বললেন, হে আবুল মুনজির! [উবাই ইবনে কা'ব এর ডাকনাম] তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন। এর একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট রয়েছে, যা দিয়ে আরশের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করে। (আহমদ)

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
إِلٰهَ	ইলাহ, মাবুদ	يَعْلَمُ	তিনি জানেন
هُوَ	সে, তিনি	أَيْدِيهِمْ	তাদের সামনে
الْحَيُّ	চিরঞ্জীব	خَلْفَهُمْ	তাদের পেছনে
الْقَيُّوْمُ	চিরস্থায়ী, সর্বসত্তার ধারক	لَا يُحِيطُوْنَ	তারা আয়ত্ত করতে পারে না, বেষ্টন করতে পারে না
لَا تَأْخُذُهٗ	তাঁকে স্পর্শ করে না	شَيْءٍ	জিনিস, বস্তু
سِنَةٌ	তন্দ্রা	عِلْمِ	জ্ঞান
نَوْمٌ	ঘুম, নিদ্রা	شَآءَ	তিনি ইচ্ছা করেছেন
السَّمٰوٰتِ	আসমানসমূহ	وَسِعَ	তা বিস্তৃত হয়েছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلْأَرْضِ	জমিন, পৃথিবী, ভূপৃষ্ঠ	لَا يَئُوْدُ	তাঁকে ক্লান্ত করে না
يَشْفَعُ	সে সুপারিশ করবে	حِفْظُ	রক্ষণাবেক্ষণ
عِنْدَهٗ	তাঁর কাছে	الْعَلِيُّ	অতিমহান, সুউচ্চ
بِإِذْنِهٖ	তাঁর অনুমতিতে	الْعَظِيْمُ	সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ	আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।
لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ	তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؕ	আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সমস্ত তাঁরই।
مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ؕ	কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ	তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন।
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ	তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ	তাঁর কুরসি আসমান ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।
وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ	আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○	আর তিনি অতি মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা

আয়াতুল কুরসিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। সকল ইবাদাত ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী, চিরঞ্জীব, শ্রবণকারী, দর্শক ও বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আসমান জমিনের বিশালতা তাঁর কাছে কিছুই না। সবাই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর অধীন। তিনি ক্লান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদির উর্ধ্বে। এককথায় তিনি সর্বশক্তিমান, সকল শক্তির আধার, মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

আয়াতের শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়।

২. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির অধিকারী।

৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি পেলে অনেকেই সুপারিশ করতে পারবে।

৪. আয়াতুল কুরসি শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ।

৫. আয়াতুল কুরসি পাঠকারী সহজে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

৬. আসমান ও জমিনের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ।

আল-হাদিস

প্রিয় শিক্ষার্থী! তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে হাদিস সর্ম্পকে জেনেছো। তোমরা সেখানে হাদিসের পরিচয়, হাদিসের গুরুত্ব ও বিশুদ্ধ কিছু হাদিস গ্রন্থের পরিচয় জেনেছো। তোমরা জানো যে, হাদিস হলো আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি। মূলত, হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ। তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে হাদিস সম্পর্কে শিখেছো। এ শ্রেণিতে হাদিসের পরিচয়, প্রকারভেদ এবং চরিত্র গঠন ও মুনাজাতমূলক দু'টি করে চারটি হাদিস শিখে বাস্তবে আমল করতে পারবে।

আল-হাদিসের পরিচয়

হাদিস (حَدِيْثٌ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো কথা, বাণী বা সংবাদ। ইসলামি পরিভাষায়, রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা.) যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন, তার সবগুলোই হাদিস।

হাদিসের সনদ (سَنَد) ও মতন (مَتْن)

হাদিসের দুটি অংশ। সনদ (سَنَد) ও মতন (مَتْن)।

সনদ (سَنَد) : হাদিস বর্ণনাকারীদের পরম্পরাকে সনদ বলে। অর্থাৎ হাদিসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে ও যে বর্ণনা পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে তাই ইলমে হাদিসের পরিভাষায় সনদ। আর যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাকে রাবি বা হাদিস বর্ণনাকারী বলে।

মতন (مَتْن) : হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলে।

সনদের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

সনদের বিবেচনায় হাদিস দুই প্রকার। যথা–

১. মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ)
২. খবরে ওয়াহেদ (خَبَرُ الْوَاحِدِ)

১. **মুতাওয়াতির** (مُتَوَاتِرٌ) :

মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) এমন হাদিসকে বলা হয়, যা এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী (রাবি) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সবার মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব এবং তাঁদের এ সংখ্যাধিক্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। যেমন: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এই হাদিসটি সকল স্তরে অসংখ্য বর্ণনাকারীর (রাবি) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) হাদিসের শর্ত:

হাদিস মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) হওয়ার জন্য ৪টি শর্ত থাকা বাঞ্ছনীয়:

(ক) অসংখ্য বর্ণনাকারী (রাবি) হওয়া। জমহুর আলেমগণের মতে হাদিস মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী প্রয়োজন।

(খ) বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক হবে যে, তাঁদের সবার একটি মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব বা বিবেক সমর্থন করে না।

(গ) সর্বকালে ও সর্বস্তরে বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্য বজায় থাকবে। কোনো অবস্থাতেই সংখ্যাধিক্য হ্রাস পাবে না, তবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

(ঘ) খবরটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হবে। যেমন বর্ণনাকারী (রাবি) বলবেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন অথবা বর্ণনাকারী বলবেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

২. খবরে ওয়াহেদ (خَبَرُ الْوَاحِدِ)

যে হাদিসের রাবি বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদিস অপেক্ষা কিছুটা কম, সে হাদিস খবরে ওয়াহেদ নামে পরিচিত। খবরে ওয়াহেদ আবার তিন প্রকার। যথা:

(১) মাশহুর (مَشْهُوْرٌ)
(২) আযীয (عَزِيْزٌ)
(৩) গরিব (غَرِيْبٌ)

(১) মাশহুর (مَشْهُوْرٌ) : মাশহুর শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ, ঘোষিত ও প্রকাশিত বিষয় বা বস্তু। পারিভাষিক অর্থে যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদিস অপেক্ষা কম; কিন্তু প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে তিনজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদিস বলে।

(২) আযীয (عَزِيْزٌ) : আযীয অর্থ কম ও বিরল হওয়া। কেননা এতে হাদিসে মুতাওয়াতির ও মাশহুরের তুলনায় বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম ও বিরল হয়ে থাকে। এর আরেকটি অর্থ হলো শক্তিশালী বা দৃঢ় হওয়া। কেননা এটি অপর একটি সূত্র দ্বারা শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়ে থাকে।

পারিভাষিক অর্থে যে হাদিস প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে দু'জন রাবি বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ কোনো স্তরেই বর্ণনাকারীদের সংখ্যা দু'জন হতে কম নয়, তাকে আযীয হাদিস বলে।

(৩) **গরিব (غَرِيْبٌ)** : গরিব অর্থ একাকি বা আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে থাকা অথবা বিরল। পারিভাষিক অর্থে যে হাদিস কোনো এক যুগে একজন মাত্র রাবি বর্ণনা করেছেন তাই হাদিসে গরিব নামে পরিচিত।

সনদ বা রাবির পরম্পরার দিক থেকে হাদিসের প্রকারভেদ

সনদ বা রাবির পরম্পরার দিক থেকে হাদিস তিন প্রকার। যথা:

(১) মারফু (اَلْمَرْفُوْعُ) হাদিস ;
(২) মাওকুফ (اَلْمَوْقُوْفُ) হাদিস;
(৩) মাকতু (اَلْمَقْطُوْعُ) হাদিস।

(১) **মারফু (اَلْمَرْفُوْعُ) হাদিস** : যে হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু‘ হাদিস বলে। অর্থাৎ যে হাদিসে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো কথা, কাজ কিংবা কোনো বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাই মারফু হাদিস নামে পরিচিত।

(২) **মাওকুফ (اَلْمَوْقُوْفُ) হাদিস** : যে হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা সাহাবি (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। অথাৎ যে হাদিসে সাহাবিদের কথা, কাজ কিংবা কোনো বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাই মাওকুফ হাদিস নামে পরিচিত।

(৩) **মাকতু (اَلْمَقْطُوْعُ) হাদিস** : যে হাদিসে তাবেয়ীর কথা, কাজ কিংবা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তা হাদিসে মাকতু‘ নামে পরিচিত।

মতনের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

মতনের ভিত্তিতে হাদিস তিন প্রকার। যথা:

(১) কওলি (قَوْلِيٌّ) হাদিস
(২) ফেলি (فِعْلِيٌّ) হাদিস
(৩) তাকরিরি (تَقْرِيْرِيٌّ) হাদিস

(১) কওলি (قَوْلِيٌّ) হাদিস: কওল শব্দের অর্থ কথা বা বাণী। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীসমূহকে কওলি (বাণীমূলক) হাদিস বলা হয়।

(২) ফে‘লি (فِعْلِيٌّ) হাদিস: ফে‘ল শব্দের অর্থ কর্ম বা কাজ। যেসব হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স) এর কোনো কাজের বিবরণ রয়েছে, সেসব হাদিসকে ফে‘লি (কর্মমূলক) হাদিস বলা হয়।

(৩) তাকরিরি (تَقْرِيْرِيٌّ) হাদিস: তাকরির শব্দের অর্থ অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া, সমর্থন করা। মহানবি (স.) এর অনুমোদনমূলক হাদিসগুলোকে তাকরিরি হাদিস বলা হয়। অনেক সময় সাহাবিগণ মহানবী (সা.) এর সামনে কোনো কাজ করেছেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) তা নিজে করেননি বা করতে বাধাও দেননি; বরং নিরব ছিলেন। এরূপ নীরবতাকে সম্মতি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর এ ধরনের হাদিসকে তাকরিরি (অনুমোদনমূলক) হাদিস বলা হয়।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে হাদিসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করে একটি ছক তৈরি করবে।

হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মাজিদের পরই হাদিসের স্থান। শরিয়তের বিধান প্রবর্তন ও মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদিস অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উৎস।

কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ওহি। নামাযে কুরআন পাঠ করা হয়। হাদিস অপ্রকাশ্য ওহি। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে কখনও মনগড়া কোনো কথা বলেননি। মহান আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, কেবল তাই তিনি বলতেন। তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশনা পেয়েই তিনি মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে জানাতেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

অর্থ: 'আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' (সূরা আন-নাজম: ৩-৪)

হাদিস কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা স্বরূপ। হাদিস ছাড়া কুরআন মেনে চলা অসম্ভব। কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ শরিয়তের সকল আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এতে শরিয়তের আহকাম, মূলনীতি ও নির্দেশাবলি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সংক্ষিপ্ত নির্দেশগুলোকে বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য মহানবি (সা.) প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই হচ্ছে হাদিস। যেমন: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আমাদেরকে নামায কায়েম করতে বলেছেন। কিন্তু কীভাবে আদায় করতে হবে, দিনে-রাতে কত ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে, প্রতি ওয়াক্তে কত রাকাআত পড়তে হবে, প্রতি রাকাআত কীভাবে পড়তে হবে, কীভাবে নামায শুরু ও শেষ করতে হবে- এর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে নেই। অনুরূপভাবে কুরআনে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ কে যাকাত দিবে, কত পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত দিতে হবে, তার কোনো নির্দেশনা কুরআনে নেই। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মহানবি (সা.) এগুলোর নিয়ম-কানুন

হাদিসের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই কুরআনের ন্যায় হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মোটকথা একজন মুসলমানের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, ইবাদাত-বন্দেগি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত নির্দেশনা আমরা রাসুলের হাদিসের মাধ্যমে লাভ করতে পারি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসুল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর, এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা হাশর, আয়াত: ৭)

মহান আল্লাহর ক্ষমা ও ভালোবাসা লাভের জন্য রাসুলের কথা-কাজ ও আদর্শের আনুগত্য করা একান্ত জরুরি। কেননা রাসুলের আনুগত্য মহান আল্লাহর অনুগত্যের নামান্তর। এতে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, তাকে ক্ষমা করে দেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন।' (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

হাদিস মহানবি (সা.) এর জীবনাদর্শকেই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাই মহানবি (সা.)- এর জীবনাদর্শের খুঁটি-নাটি জানতে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর রাসুল (সা.)- এর অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হলে হাদিসের বিকল্প নেই। অন্য দিকে রাসুলের আনুগত্য ও অনুসরণের অর্থই হলো মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। হাদিসের অনুসরণের মাঝেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য নিহিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে রাসুলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০)

আল-কুরআন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান উৎস। আর দ্বিতীয় উৎস হলো হাদিস। হাদিস কেবল রাসুল (সা.)- এর কথা ও কাজের বর্ণনা তা নয়, এটা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের সমষ্টি। তিনি ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মহান আল্লাহ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান দান করেছেন। সেই জ্ঞান আমরা হাদিস শাস্ত্রেই খুঁজে পাই। পথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত হিদায়েতের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হলে হাদিসের অনুসরণ করতে হবে। মহানবি (সা.) নিজে হাদিসের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ

অর্থ: 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতদিন এগুলোকে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।' (মুয়াত্তা)

বস্তুত কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দু'টি উৎস। কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও নির্দেশ যেমন মানুষকে সত্য ও সৎপথের সন্ধান দেয়, তেমনি হাদিসও সমস্ত মানবজাতিকে ন্যায় এবং শান্তির পথে পরিচালিত

করে। তাইতো মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে মুসলিম জাতিকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেন-'যারা এখানে উপস্থিত, তাদের দায়িত্ব হলো, যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেওয়া।' (বুখারি)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মানবজীবনে মহানবি (সা.) এর হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হাদিসকে অস্বীকার করা কিংবা অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং আমরা মহানবি (সা.)- এর হাদিস অনুযায়ী আমল করবো এবং নিজেদের জীবন হাদিসের আলোকে সাজাবো।

কাজ:
শিক্ষার্থীরা হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ির খাতায় লিখে আনবে।

চরিত্র গঠন ও মুনাজাতমূলক হাদিস

চরিত্র গঠনমূলক দু'টি হাদিস

প্রিয় শিক্ষার্থী! তোমরা জান যে, চরিত্র মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। পৃথিবীর সকল নবি-রাসুলকে প্রেরণ করা হয়েছিল মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য। এমনকি মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কেও উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মহানবি (সা.) বলেন, আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তাই আমাদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অন্যদিকে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও মুনাজাত করে মানব জাতি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আল্লাহর অফুরন্ত কল্যাণ লাভেও ধন্য হতে পারে। তাছাড়া মুনাজাতের মাধ্যমে বান্দা তার গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকে। এ সম্পর্কে রাসুল (সা.) -এর অসংখ্য হাদিস রয়েছে। তাহলে চলো আজ আমরা উন্নত চরিত্র গঠন ও মুনাজাতমূলক হাদিস শিখবো।

হাদিস– ১

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

অর্থ: 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।' (ইবনু হিব্বান)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা: পরোপকার মানব চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তম গুণ। মহান আল্লাহ পরোপকারীকে ভালোবাসেন। মহানবি (সা.) নিজে পরোপকারী ছিলেন এবং উম্মতকে অন্যের উপকার করার জন্য উৎসাহ দিতেন। আলোচ্য হাদিসে মহানবি (সা.) মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি সদয় হতে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায়

উপকার করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তবে এখানে কেবল পার্থিব বা বস্তুগত উপকার উদ্দেশ্য নয়; বরং দুনিয়া ও আখিরাতে যত রকমভাবে মানুষকে উপকার করা যায়, সবই এই হাদিস এর উদ্দেশ্য। দুনিয়ায় একজন মানুষকে নানাভাবে উপকার করা যায়। যেমন অভাবীকে অর্থ দিয়ে, রোগীর সেবা করে ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকেও একজন মানুষকে উপকার করা যায়। এই উপকার পার্থিব উপকারের চেয়েও মহান। যেমন পথভ্রষ্ট কাউকে সঠিক পথ দেখানো, আল্লাহর পরিচয় জানানো, সঠিক জ্ঞান দান করা, ভালো মানুষ হতে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের কল্যাণ চান। তাই তিনি যখন দেখেন আমরা তাঁর অপর বান্দার উপকার করছি, তখন তিনি খুবই খুশি হন। পরোপকারীর যাবতীয় প্রয়োজন তিনি নিজেই তখন পূর্ণ করে দেন। পরোপকারকারীকে সর্বোত্তম মানুষদের কাতারে নিয়ে আসেন।

সুতরাং আমরা সবসময় আমাদের সাধ্যমতো অন্যের উপকার করব। কখনও কারো ক্ষতি করব না। তাহলেই আমরা মহান আল্লাহর দরবারে সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতে পারব।

হাদিস– ২

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থ: 'প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।' (বুখারি)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা: মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। বিপদে-আপদে একে অপরকে সাহায্য করবে। তার জান-মাল ও মান-সম্মান হেফাযত করবে। শত্রুর কবল থেকে তাকে রক্ষা করবে। কখনও বিপদের মুখে ঠেলে দিবে না। কোনো ক্ষতি করবে না ও অকল্যাণ কামনা করবে না।

মানুষ দুইভাবে অপরের ক্ষতি করতে পারে। কথা দিয়ে এবং সরাসরি শক্তি প্রয়োগ করে। এই হাদিসের শিক্ষা হলো, একজন প্রকৃত মুসলিম কখনও কোনোভাবে অপরের ক্ষতি করতে পারে না। কারণ অপরের ক্ষতি করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

মুখ দিয়ে অপরকে গালিগালাজ করা যায়, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যায়, পশ্চাতে নিন্দা করা যায়। সর্বোপরি মিথ্যা বলে কারো সম্মানহানি করা যায়। সবগুলো কাজই চরম নিন্দনীয় ও ইসলামি আদর্শের বিপরীত। অন্যদিকে হাত বা বল প্রয়োগ করে অপরকে মারধর করা থেকে শুরু করে তার জীবন পর্যন্ত বিনষ্ট করা যায়। অথচ অপরকে বিনা কারণে আঘাত করা হারাম। যে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে জাহান্নামি হবে। তাই আমরা কখনও মুখে যেমন কারও ব্যাপারে খারাপ কথা বলবো না, তেমনি কারও বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে

শক্তি প্রয়োগ করবো না। আমরা একে অপরের প্রতি সহনশীল হবো। ক্ষমাশীল হবো। তাহলেই আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারবো।

মুনাজাতমূলক দু'টি হাদিস

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি মহানবি (সা.)-কে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি সর্বদা সৃষ্টিজগতের কল্যাণ কামনা করতেন। মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ ও পথ দেখিয়ে দিতেন। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে মহান আল্লাহর অফুরান নিয়ামত লাভের জন্য আমাদেরকে মুনাজাতের শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবি (সা.)-এর অসংখ্য মুনাজাতমূলক হাদিস রয়েছে। আজকের পাঠে আমরা মহানবি (সা.)- এর মুনাজাতমূলক দু'টি হাদিস শিখব।

হাদিস– ১

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكَذِبِ
وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ-

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা ত্বহ্হির কলবী মিনান্ নিফা-কি ওয়া 'আমলী মিনার্ রিয়া-য়ি ওয়া লিসা-নী মিনাল কাযিবি ওয়া'আইনী মিনাল খিয়া-নাতি।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে মুনাফিকি হতে, আমার কাজকে লোক দেখানো হতে, আমার জবানকে মিথ্যা বলা হতে এবং চোখকে খিয়ানাত করা হতে পাক-পবিত্র করো। (বায়হাকী)

হাদিস– ২

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ ، وَالْعِفَّةَ ، وَالْأَمَانَةَ ،
وَحُسْنَ الْخُلُقِ ، وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকাস-সিহ্হাতা ওয়াল 'ইফ্ফাতা ওয়াল আমানাতা ওয়া হুসনাল-খুলুকি ওয়ার-রিদা বিল-কাদরি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারি, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা প্রার্থনা করছি। (বায়হাকী)

উপরোক্ত হাদিস দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাতমূলক হাদিস। প্রথম হাদিসে মুনাফিকি, রিয়া, মিথ্যা, খিয়ানাত হতে

রক্ষার এবং ২য় হাদিসে সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারি, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে প্রার্থনা শিখানো হয়েছে। আমরা অর্থসহ হাদিস দু'টি শিখব। এগুলোর মাধমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'কুরআন-হাদিসের যে শিক্ষায় আমার জীবন আলোকিত করবো'

উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে আল কুরআন-হাদিসের যে যে শিক্ষা আমার দৈনন্দিন জীবনে চর্চা বা অনুশীলন করবো তা নির্ধারিত ছকে লিখে আনবো। এক্ষেত্রে তুমি তোমার পরিবারের সদস্য/সহপাঠী/শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।

সূরা/হাদিসের নাম	সূরা/হাদিস থেকে যে শিক্ষা পাই	বাস্তবজীবনে যেভাবে চর্চা করবো
সূরা আল মাউন	আশে-পাশের মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না।	নিয়মিত যথাসময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সালাত আদায় করবো।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

প্রিয় শিক্ষার্থী!

ইতোমধ্যে তুমি আখলাক ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছ। পূর্বের শ্রেণিতে কতিপয় আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদেরকে কিন্তু আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে কেবল বিস্তারিত জানলেই চলবে না, জানার সাথে সাথে আখলাকে হামিদাহগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা, কাজ, চলা-ফেরা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। আর আখলাকে যামিমাহগুলো আমাদেরকে বর্জন করে চলতে হবে। আমাদের স্বভাব ও আচরণে যেন কোনো আখলাকে যামিমাহ অনুপ্রবেশ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে কলুষিত না করতে পারে সে ব্যাপারে সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মুসলমানরা একসময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণায় যেমন বিশ্ব সভায় উচ্চ আসনে আসীন হয়েছিলো, তেমনি উত্তম চরিত্র এবং উন্নত আদর্শের ক্ষেত্রেও মুসলমানরা এ বিশ্বের বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো।

তোমরা জানো, ইসলাম মানুষের সৎচরিত্রের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। ইসলাম উত্তম চরিত্রের অধিকারি ব্যক্তিকে সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা 'সুমহান চরিত্রের অধিকারী' বলে সত্যায়ন করেছেন। আবার উত্তম চরিত্র প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতাদানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।' মহানবি (সা.)- এর এ বাণী থেকে আমরা উত্তম চরিত্রের গুরুত্বের কথা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। তাই, মহানবি (সা.) ও মহান চরিত্রের অধিকারী আমাদের অন্যান্য পূর্বসূরীদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আবার আমরা বিশ্ব মানব সভ্যতায় উত্তম চরিত্র ও আদর্শের রোল মডেল হতে চাই। অন্যান্য জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং ধর্মের মানুষের সামনে আমাদের পরিচয় যেন আমাদের উন্নত চরিত্র ও আদর্শের মাধ্যমে ফুটে ওঠে, এ জন্য আমরা চেষ্টা করবো। পাশাপাশি মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবো।

পূর্বের শ্রেণির ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে তুমি আরও কতিপয় আখলাকে হামিদাহ এবং আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এবার তাহলে আখলাকে হামিদাহ'র বিষয়বস্তু দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

আখলাকে হামিদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র)

দানশীলতা

দানশীলতা একটি মহৎ গুণ। সমাজের দরিদ্র, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে দানশীলতা বলা হয়। দানশীলতার প্রতিশব্দ বদান্যতা, উদারতা ও মহত্ত্ব ইত্যাদি। এটি মহান আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা অর্জনের বিশেষ মাধ্যম। দানশীল ব্যক্তিকে সকলে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করে। কেউ ধনী আবার কেউ গরিব। ধনীদের উচিত গরিবদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সমাজের গরিব লোকদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতা প্রকাশ করা একটি মহৎ কাজ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মু'মিনগণ ! আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা হতে সেদিন আসার পূর্বেই ব্যয় করো যেদিন কোনো ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪)

দান করা একটি ফযিলতপূর্ণ কাজ। দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত নেকি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দানশীলতার ফযিলত বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহর পথে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজের ন্যায়; তা হতে উৎপন্ন হলো সাতটি শীষ, প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা আরও বর্ধিত করে দেন, বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬১)

দানশীলতা মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী এবং জান্নাতেরও নিকটবর্তী। জাহান্নামের আগুন থেকে দূরবর্তী। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ। এর ডাল-পালা দুনিয়াতে ছড়িয়ে আছে। যে এর কোনো একটি ধারণ করবে তা তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আর কৃপণতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। কেউ এর কোনো ডাল ধারণ করলে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।' (বায়হাকী)

দানশীলতা মানুষের পাপ মোচন করে দেয়, মহান আল্লাহর ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়। দান করলে বিপদ-আপদ দূর হয়। সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং পবিত্র হয়। মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। কেননা তিনি নিজেই দয়ালু ও দানশীল। তাইতো তিনি তাঁর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে দয়ালু ও দাতা নাম দু'টি গ্রহণ করেছেন।

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল হলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। তাঁর দানের কোনো তুলনা করা সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠদাতা। তাঁর কাছে কেউ কিছু চেয়েছে আর তিনি জবাবে না বলেছেন, জীবনে এমনটি

কখনো হয়নি। তিনি এমন পরিমাণ দান করতেন যে, দানগ্রহণকারী বিস্মিত হয়ে যেত। কোন প্রার্থনাকারীকে দেওয়ার মত কিছু না থাকলে তিনি তাকে পরে দেওয়ার ওয়াদা করতেন এবং সে ওয়াদা তিনি পূর্ণ করতেন। কখনও কখনও তিনি অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়েও দান করতেন।

মহানবি (সা.) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহাবিগণও দানশীলতার সর্বোত্তম আদর্শ দেখিয়েছেন। তাঁরা মানুষের সহযোগিতায় সামর্থ্যের সবটুকু আল্লাহর রাস্তায় দান করেছেন। তাবূক অভিযানের সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। তাঁর দানে অভিভূত হয়ে মহানবি (সা.) বললেন, হে আবু বকর! তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ? তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি। হযরত আবু বকরের দানশীলতার এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

দান করার জন্য আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দান প্রকাশ্যে করা যায় আবার গোপনেও করা যায়। তবে গোপনে দান করা উত্তম। দানের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার নিয়তে প্রকাশ্যে দান করা দোষের কিছু নয়।

কখনো কোনো সাহায্য প্রার্থনাকারীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। কিছু দিতে না পারলেও তার সাথে হাসি মুখে কথা বলা উচিত। কেননা কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলাও এক ধরনের সাদাকাহ। আবার দান করে খোঁটা দেওয়া যাবে না। এতে দানের ফযিলত নষ্ট হয়ে যায়।

আমরা দানশীলতার এই মহৎ গুণটি অর্জন করবো। সবসময় সাধ্যমতো দান করবো। দান করতে কখনও কার্পণ্য করবো না। সমাজ থেকে অভাব ও দারিদ্র্য দূর করতে ভূমিকা রাখবো।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে দানশীলতার ফযিলতগুলো আলোচনা করবে।

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়িতা মানবচরিত্রের একটি প্রশংসনীয় গুণ। মিতব্যয় মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা আনে।

মিতব্যয়িতা মানে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করা। কিংবা 'আয় বুঝে ব্যয় করা'। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই হলো মিতব্যয়িতা। শুধু ব্যয়ের ক্ষেত্রে নয়; বরং কথাবার্তা, হাঁটা-চলায়ও ইসলামে মধ্যপন্থার নির্দেশ রয়েছে।

অপচয় ও কৃপণতা এই দুই প্রান্তিকতার মাঝখান হলো মিতব্যয়িতা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া

জরুরি। মিতব্যয়িতার মাধ্যমেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব। তাই মানুষের জীনবযাত্রায় মিতব্যয়িতার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিরা খরচের ক্ষেত্রে অপচয়ও করেন না। আবার কৃপণতাও করেন না। তাঁরা নিজ প্রয়োজন মতো খরচ করেন। যাতে অন্যের কাছে হাত পাতা না লাগে। মিতব্যয়িতা মুমিন চরিত্রের অন্যতম গুণ।

মিতব্যয়ীকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। সকল ধর্মে মিতব্যয়কে উৎসাহিত করা হয়েছে। কার্পণ্য ও অপব্যয়কে নিন্দা করা হয়েছে। মিতব্যয় মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং অন্যকে সাহায্য করার পথ উন্মুক্ত করে।

একদিকে প্রতিবছর বিশ্বে কোটি কোটি টন খাদ্য অপচয় হয়। অন্যদিকে বিশ্বে প্রতিদিন অনেক মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়। আর এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন মিতব্যয়িতা। আবার আমরা যদি সব জায়গায় বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস প্রভৃতি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হই। তাহলে এসব ক্ষেত্রে অপচয় নিয়ন্ত্রণ হবে। ফলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

মিতব্যয়িতার সঙ্গে সঞ্চয়ের একটি বড় সম্পর্ক রয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো সে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি। মিতব্যয়িতার মাধ্যমে সঞ্চয় করে সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। সঞ্চয় যত বৃদ্ধি পাবে, দেশের অর্থনীতি তত সমৃদ্ধ হবে। পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) মিতব্যয়িতার অভ্যাস তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ মিতব্যয়ীকে আল্লাহ তা'আলা দারিদ্র্যমুক্ত জীবন দান করবেন। রাসুলে কারিম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে সে নিঃস্ব হয় না'। (মুসনাদে আহমাদ)

মিতব্যয়িতার মাধ্যমে হালাল পন্থায় সঞ্চয় করে মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হতে পারে। ইসলাম এতে নিষেধ করে না; বরং সঞ্চিত অর্থ থাকলেই তো জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায়। সদকায়ে জারিয়ার ধারা চালু করা যায়। আবার উদ্বৃত অর্থ যখন নেসাব পরিমাণ হবে তখন যাকাতের মতো আরেকটি মহান ইবাদাতেরও সুযোগ মিলবে।

আমাদের প্রিয় নবি (সা.) ছিলেন মিতব্যয়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর ও পরিবারের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করতেন। অতিরিক্ত সম্পদ তিনি দান করে দিতেন। আমরা মুমিন-মুত্তাকিদের জীবনী থেকেও মিতব্যয়িতার শিক্ষা পাই। মিতব্যয়ী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে ইসলামের দিকে হেদায়েত করা হয়েছে, তার প্রয়োজন মাফিক জীবনোপকরণ আছে এবং সে তাতে সন্তুষ্ট রয়েছে'। (তিরমিযি)

মিতব্যয়িতা মানুষকে লোভ-লালসা, অপচয়, অপব্যয়, কৃপণতা, অলসতা ও আরামপ্রিয়তা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই আমরা সবাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হব। তাহলে আমাদের জীবন হবে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী।

একক কাজ/জোড়ায় কাজ

তুমি জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কীভাবে দানশীলতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি একক/জোড়ায় দৈনন্দিন জীবনে দানশীলতা এবং মিতব্যয়িতার প্রয়োগক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে লিখে উপস্থাপন করো।)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সম্মানজনক আচরণ করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। তাদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে অন্ধকে পথ ভুলিয়ে দেয় সে অভিশপ্ত'। (মুসনাদে আহমাদ)

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' অনুসারে প্রতিবন্ধিতা অর্থ যেকোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে কুসংস্কার

প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত। যেমন, প্রতিবন্ধী শিশু বাবা মায়ের পাপ বা অভিশাপের ফল, প্রতিবন্ধী শিশুর ওপর জিনের প্রভাব আছে, প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মের জন্য বাবা-মায়ের অসচেতনতা দায়ী, মায়ের দোষে এমন শিশুর জন্ম হয়, প্রতিবন্ধী শিশু পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য অভিশাপ ইত্যাদি। আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবারকে উপহাস করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এমন আচরণ নিষিদ্ধ করে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১১)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে অভিভাবকের অনেক ভাবনা। প্রতিবেশীরা কী বলবে, আত্মীয়স্বজনরা কী ভাববে? এসব ভেবে তাদেরকে কখনোই ঘরের বাইরে নেওয়া হয় না। তাদেরকে ঘরবন্দি করে রাখা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুর

বিকাশ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সেজন্য এসব কুসংস্কার দূর করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মর্যাদা ও সম্মানের দাবিদার। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদা অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। তিনি মদিনার বাইরে গেলে অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে (রা.) মদিনার অস্থায়ী শাসক নিয়োগ করতেন। অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি যে ব্যক্তির দু'টি প্রিয় চোখ কেড়ে নিয়েছি, অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করেছে। সে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে বলে মনে করে এবং সওয়াবের আশা করে, আমি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট হব না'। (তিরমিযি)

ইসলাম প্রতিবন্ধী ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য শরিয়তের বিধিবিধান পালনে ছাড় দিয়েছে। প্রত্যেক ফরয বিধান তাদের সাধ্যের ওপর নির্ভর করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অর্থ: 'আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার

প্রতিবন্ধীতা মানবজীবনের এক দুর্বিষহ অধ্যায়ের নাম। জন্মগত, দুর্ঘটনা কিংবা অসুস্থতা যে কারণেই হোক, ইসলাম সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করতেন। রাসুলুল্লাহকে (সা.) অনুসরণ করে মুসলিম খলিফারাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তারা সমাজের অসহায়-প্রতিবন্ধী লোকদের নামের তালিকা করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ ভাতার ব্যবস্থা করেন। প্রতি দু'জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দেখভালের জন্য একজন খাদেম নিযুক্ত করেন। বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবাকেন্দ্র চালু করেন।

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দায়িত্ব নেওয়া ফরযে কেফায়া। রাষ্ট্র যদি এ দায়িত্ব পালন না করে বা দেশের কোনো নাগরিকই তাদের সেবায় এগিয়ে না আসে, তাহলে সমাজের প্রতিটি মুসলমান এর জন্য দায়ী ও গুনাহগার হবে। পরকালে এ জন্য কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কারও দয়া চায় না। অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। দক্ষতা অর্জন করে স্বনির্ভর হতে চায়। আমাদের উচিত তাদের ব্যাপারে সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দেওয়া। ইসলাম তাদের যে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা নিশ্চিত করা।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। আমরা প্রতিবন্ধীদের ভালোবাসব এবং তাদের যথাযথ সম্মান ও সহযোগিতা করব।

রোগীর সেবা

রোগীর সেবা বলতে বুঝায়, রোগীকে দেখতে যাওয়া, খোঁজ-খবর নেওয়া, প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা করা, সাহায্য করা, সাহস যোগানো, নরম ও সদয় কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি।

রোগীর সেবা করা সুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য এবং সেবা প্রাপ্তি রোগীর অধিকার। হাদিসের আলোকে এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের প্রতি যে ছয়টি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তার মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করা অন্যতম।

অসুখ হলে অসুস্থ ব্যক্তি অসহায় হয়ে পড়েন। অনেক সময় তার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। নিজে চলাফেরা করতে পারেন না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন না। এ সময় একজন রোগীর সেবা করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে তার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করা। একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর চেয়ে উত্তম কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

রোগীর সেবা করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। রোগীর সেবা করা মহান আল্লাহর সেবা করার শামিল। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি।' বান্দা বলবে, 'আপনি তো সারা বিশ্বের পালনকর্তা। আমি আপনাকে কীভাবে সেবা করতে পারি?' আল্লাহ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। তুমি তার সেবা করলে সেটা আমারই সেবা করা হতো।' (মুসলিম)

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া মহানবি (সা.) এর আদর্শ। কেউ অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন। রোগীর কপালে হাত রেখে স্নেহভরে খোঁজ-খবর নিতেন এবং তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করতেন। জানতে চাইতেন, 'তোমার কি কিছু খেতে মনে চায়?' রোগী কোনো খাবারের কথা বললে তিনি দ্রুত তার ব্যবস্থা করতেন।

অমুসলিম কেউ অসুস্থ হলেও তিনি তাকে দেখতে যেতেন। একবার এক ইহুদি বালক অসুস্থ হয়ে পড়লো। মহানবি (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার কাছে বসে অত্যন্ত মমতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বালকটি তখন ইসলাম গ্রহণ করলো। তখন মহানবি (সা.) বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এই যুবককে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।' (বুখারি)

একবার মহানবি (সা.) এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান (রা.) খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) তাঁকে দেখার জন্য আসলেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, 'কোনো মুসলিম সকালবেলা কোনো রোগীকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সাথে রওয়ানা দেয়। প্রত্যেক ফেরেশতাই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে। তার জন্য জান্নাতে একটি বাগানও তৈরি করা হয়। আর সে যদি

সন্ধ্যাবেলা কোনো রোগীকে দেখতে বের হয়, তাহলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সাথে রওয়ানা দেয়। প্রত্যেক ফেরেশতাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান বরাদ্দ করা হয়'। (আবু দাউদ)

তবে রোগী দেখতে গিয়ে বেশি সময় রোগীর কাছে অবস্থান করা উচিত নয়। এতে রোগী ক্লান্ত হয়ে যায়। তার পরিবারেরও কষ্ট হয়। তবে প্রয়োজন থাকলে বা রোগী কিংবা তার পরিবার আগ্রহী হলে দীর্ঘ সময় অবস্থান করাতে কোনো দোষ নেই। রোগীকে খুশি করতে বারবার দেখতে যাওয়া উত্তম। রোগীর গায়ে হাত রাখা এবং তার আরোগ্যের জন্য দু'আ করা সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো রোগী দেখতে যেতেন, তখন ডান হাত দিয়ে রোগীর কপাল স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, 'হে মানুষের প্রভূ! রোগ-শোক দূর করুন, আরোগ্য দিন, আপনি আরোগ্যদাতা, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই, যা কোনো রোগকে অবশিষ্ট রাখে না' (বুখারিও মুসলিম)। রোগীর সেবা করা ও তাকে দেখতে যাওয়ার সময় উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত।

সুতরাং কেউ অসুস্থ হলে আমরা স্বেচ্ছায় তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবো। তার সেবা-শুশ্রূষা করবো। বিশেষ করে যারা অসহায়, অনাথ ও দরিদ্র, তাদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিবো। তাদের পুষ্টিকর খাবার ও প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে সহায়তা করবো। আশাব্যঞ্জক কথা বলে তাদের মনকে প্রফুল্ল রাখবো। তাহলেই রোগীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হবে।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

তুমি নিজ পরিবার/প্রতিবেশি কোন অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় নিজেকে যেভাবে সম্পৃক্ত করেছো/ করতে পারো।

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি একটি চেকলিস্ট পূরণ করে আনবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার মা-বাবা, সহপাঠী বা শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।)

ক্রমিক	কার্যক্রম	করেছি	করবো
১.	মা-বাবা অসুস্থ হলে তাদের সময় মতো ঔষধ সেবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।	√	
২.	প্রতিবেশি/আত্মীয় অসুস্থ থাকলে/হলে তার খোঁজ খবর নেওয়া।		√
৩.			
৪.			
৫.			

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অন্যতম মহৎগুণ। মর্যাদার দিক থেকে নারী-পুরুষকে ইসলাম আলাদা করেনি। ইসলাম নারী জাতিকে যথাযথ অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হলো নারী জাতির প্রতি উত্তম আচরণ করা, তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা।

ইসলামে নারীর সম্মান ও মর্যাদা

নারীর মর্যাদা বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। ইসলাম নারীকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। কেননা ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। সে সময় নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হতো না। তাদের সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কন্যা সন্তানকেও জীবন্ত কবর দিত। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া অমর্যাদার প্রতীক মনে করা হতো।

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। একদিন জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, অতঃপর কে? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা। (বুখারি) এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের উপর পিতার চাইতেও মাতার অধিকার তিন গুণ বেশি। এটি মা হিসেবে নারীর অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক।

কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা অপরিসীম। কন্যাদের ভালোভাবে প্রতিপালনের জন্য ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'মেয়ে শিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক'। হাদিসে আরও আছে, 'যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যা সন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়'। (তিরমিযি)

ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক'। (মুসলিম) তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম'। (তিরমিযি) স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান স্বামীর অনুরূপ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার'। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮)

অনেক পরিবারে মনে করা হয় পরিবারের ছেলেরা 'বংশের বাতি', তারা মা-বাবাকে রোজগার করে খাওয়াবে, দেখাশোনা করবে আর মেয়েরা তো চলে যাবে পরের বাড়ি! কাজেই খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়া সব ব্যাপারেই

সকলের মনোযোগ থাকে ছেলেদের প্রতি। ইসলাম এমন আচরণ করতে নিষেধ করেছে। মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন, ‘কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে (শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা না করে এবং তার পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’। (আবু দাউদ)

নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা মুমিনের নিদর্শন। নারীর প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে ইমান পূর্ণ হয় না। নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে মুমিনদেরকে নানা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহারকারীদের উত্তম উম্মত হিসেবে বর্ণনা করে বলেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ

অর্থ: ‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম’। (তিরমিযি)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে। যে তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও নিজ পরিবারের প্রতি অধিক সদয়’। (তিরমিযি)

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মহর প্রদান অপরিহার্য করেছে। কিন্তু অনেক মুসলিম মহর আদায় করে না। আবার কেউ আংশিক আদায় করে। আবার কেউ যৌতুক গ্রহণ করে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত কাজ। মহর আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ

অর্থ: ‘আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে।’ (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪)

ইসলাম নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে নারীদেরকে তাদের উত্তরাধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা হয়। কেউ আংশিক সম্পত্তি দেন। কেউ সামান্য কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি লিখে নেয়। কেউ বাড়ি, গাড়ি, স্বর্ণ অলংকার, নগদ টাকা দিতে চায় না। মনে করে নারীরা অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয় না। আবার কেউ সম্পূর্ণ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। এটা নারীদের ওপর সবচেয়ে বড় যুলুম, যা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। ইসলাম নারী পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানিয়েছে নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ’। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭)

পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য নারীর প্রতি সম্মানবোধ থাকা আবশ্যক। অন্তর থেকে

নারীদের সম্মান করতে হবে। পাশাপাশি নিজ আচরণ ও কর্ম দ্বারাও এর প্রমাণ দিতে হবে। এতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন। তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

দলগত কাজ

আমি আমার পরিবার, প্রতিবেশি, বিদ্যালয়ে নারীদের যে যে উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করবো।

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি/তোমরা একটি তালিকা তৈরি করো।

যে ক্ষেত্রে সম্মান করবো	যাকে সম্মান করবো	যে উপায়ে সম্মান করতে পারি
পরিবার	মা, বোন	গৃহের কাজে সহায়তা করবো।
প্রতিবেশি		
বিদ্যালয়ে		

দেশপ্রেম

দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত স্বভাব। সকল ধর্মের লোকই তাদের দেশকে ভালোবাসে। মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি মানুষের এই ভালোবাসাকে ইসলাম কেবল সমর্থনই করে না; বরং একজন প্রকৃত মুমিনকে এগুলো ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাসুলকেই স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন। মাতৃভূমি ও জন্মস্থানের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও আকর্ষণই হলো দেশপ্রেম। এ ভালোবাসা মানুষের অন্তর থেকে আসে। আজীবন মানুষ এ আকর্ষণ ও ভালোবাসা অনুভব করে।

দেশপ্রেমের উপায়

দেশের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে। কারণ তিনিই আমাদেরকে স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড দান করেছেন। যাঁরা স্বাধীনতা অর্জনে ত্যাগ ও অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রতি সম্মান জানানো, তাদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা আমাদের কর্তব্য।

নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের সংবিধান, প্রচলিত আইন ও বিধি মেনে চলা, নিয়মিত 'কর' পরিশোধ করা এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা। এছাড়াও ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করা, নিজস্ব কৃষ্টি ও মূল্যবোধ চর্চা করা, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক হওয়া, সন্ত্রাস, হানাহানি, মারামারি ও বিশৃঙ্খলা না করা দেশপ্রেমের অংশ।

একজন প্রকৃত মুমিন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হয়ে থাকেন। তাই ইসলামের আলোকে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ

মানুষকে স্বদেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। কারণ স্বদেশকে হেফাযত করতে না পারলে ধর্মকে হেফাযত করা যায় না। দেশের মানুষ ও তাদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করা যায় না।

দেশের জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ রক্ষা করা একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কিয়ামত হয়ে যাবে এটা যদি আগেভাগে অনুমান করতে পারো, তাহলেও হাতে রক্ষিত গাছের চারা রোপণ করে দাও।’(আদাবুল মুফরাদ)

জনস্বার্থ বিরোধী কাজ হলো দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, খাদ্যে ভেজাল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যে ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশানো ইত্যাদি। দেশপ্রেমিক নাগরিক এসব কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং এসব কাজ প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকবে।

দেশপ্রেমের গুরুত্ব

মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ইসলামি মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোনো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে না পারলে মান-সম্মান, স্বাধিকার, ইমান ও আমল হেফাযত করা অসম্ভব। এজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেশপ্রেমের গুরুত্ব অত্যধিক।

মক্কা থেকে বিদায়ের সময় রাসুল (সা.) বলেছিলেন, ‘ভূখন্ড হিসেবে তুমি কতই না উত্তম, আমার কাছে তুমি কতই না প্রিয়। যদি আমার স্বজাতি আমাকে বের করে না দিত, তবে কিছুতেই আমি অন্যত্র বসবাস করতাম না’ (তিরমিযি)। হিজরত করে মদিনায় গমন করার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই মক্কায় ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ‘যিনি আপনার জন্য কুরআনকে জীবনবিধান বানিয়েছেন, তিনি আপনাকে অবশ্যই আপনার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।’ (সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৫)

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) স্বদেশকে ভালোবাসতেন। হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পর আবু বকর (রা.) ও বেলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তখন তাদের মনেপ্রাণে মক্কার স্মৃতিগুলো ভেসে উঠেছিল। সে সময় তারা মক্কার দৃশ্যাবলি স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের মনের এ অবস্থা দেখে প্রাণভরে দোয়া করেন, ‘হে আল্লাহ! আমরা মক্কাকে যেমন ভালোবাসি, তেমনি তার চেয়ে বেশি মদিনার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দান কর’।

জীবনে সফলতা অর্জন প্রত্যেকেরই লক্ষ্য থাকে। দেশপ্রেম সফলতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। মাতৃভূমি মানুষের জন্য শান্তির আশ্রয়। মাতৃভূমির পরশে যে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া যায় তা অনন্য। কোনো সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে উহুদ পাহাড় চোখে পড়লে নবিজি (সা.)-এর চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে উঠতো। তিনি বলতেন, ‘এই উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও উহুদ পাহাড়কে ভালোবাসি।’ (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং আমরা দেশকে ভালোবাসবো। ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশের কল্যাণে অবদান রাখবো।

শালীনতা

শালীনতার শাব্দিক অর্থ মার্জিতকরণ, সংশোধন করা, পরিশোধন, লজ্জাশীলতা, বিনম্রতা, ভদ্রতা, বেশ-ভূষা,কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মার্জিত হওয়া। যে আচার আচরণ, কথা বার্তা, চলাফেরা ও পোশাক-পরিচ্ছদে ভদ্র, সভ্য, বিনম্র মার্জিত ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাকে শালীনতা বলা হয়। শালীনতা একক কোনো গুণের নাম নয়। এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। অনেক গুণের সম্মিলিত রূপ শালীনতা। অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা, উগ্রতা, অহংকার কদর্যতা ইত্যাদি শালীনতার বিপরীত।

শালীনতার গুরুত্ব

শালীনতা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূলভিত্তি। একটি সুন্দর সমাজ গঠনে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ইসলাম মানুষকে মার্জিত, রুচিশীল, নম্র-ভদ্র ও শালীন হওয়ার শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ আমাদের শালীনতার শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে শালীনতার যে উপদেশ দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখ আছে। তিনি বলেছিলেন, 'অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলো না, কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধত-অহঙ্কারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।' (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৮)

মানুষের মধ্যকার সকল প্রকার পাশবিকতা ও কুপ্রবৃত্তিকে অবদমিত করার জন্য শালীনতা একান্ত অপরিহার্য। কেননা অশালীন আচার-আচরণ ও বেশ-ভুষা মানুষের মধ্যকার সুপ্ত কুপ্রবৃত্তিসমূহকে জাগিয়ে তোলে। তখন মানুষ যে কোনো অসৎ ও অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করে না। শালীনতার চর্চার মাধ্যমেই এসব অন্যায় থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

শালীনতা মানুষকে পাপাচার থেকে পূতঃপবিত্র রাখে। কেননা অশালীনতা, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতা সমাজে পাপের দুয়ার খুলে দেয়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবে শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নারী পুরুষের দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছেন।

শালীনতার অন্যতম দিক হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। মহানবি (স.) বলেন 'তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো'। (বুখারি) তিনি আরও বলেন,

اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

অর্থ: 'লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়'। (মুসলিম)

লজ্জাশীলতা ঈমানেরও অঙ্গ। তাই একজন মুমিন অবশ্যই ভদ্র, লজ্জাশীল ও মার্জিত হবেন। যেমন মহানবি (স.) বলেন–

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ: ‘লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা।’ (নাসাঈ)

কারো আচার-আচরণ মার্জিত হলে সবাই তাকে ভালোবাসে। অন্যদিকে কারো আচরণ, কথাবার্তা অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ অশালীন হলে কেউই তাকে ভালোবাসে না। সবাই তাকে খারাপ মনে করে। এজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,‘অশ্লীলতা যেকোনো জিনিসকে খারাপ করে এবং লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।’ (তিরমিযি)

শালীনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মার্জিত ও রুচিশীল পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা। শালীনতার জন্য শালীন পোশাক অপরিহার্য। শালীনতাপূর্ণ জীবনাচারণে সমাজ উন্নত হয়। পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অশোভন আচরণ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করে, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। অশালীন ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না। মহানবি (সা.) বলেন, ‘মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।’ (বুখারি) এমন মানুষকে আল্লাহ তা‘আলাও পছন্দ করেন না। হাদিসে এসেছে, ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।(তিরমিযি)

সুতরাং আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীনতার চর্চা করবো। কথা-বার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার কোনো কিছুতেই যেন উগ্রতা, অশ্লীলতা, অশালীনতা প্রকাশ না পায় সেদিকে খেয়াল রাখবো। তাহলেই আমাদের জীবন সুন্দর ও সার্থক হবে। সকলে আমাদের ভালোবাসবে। আর সমাজেও সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করবে।

প্যানেল আলোচনা

‘কুরআন-হাদিসের আলোকে দেশপ্রেম চর্চা করি, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি’

‘শালীনতা জেনে/বুঝে নেই, নিজেকে আধুনিক করি’

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

আখলাকে যামিমাহ (নিন্দনীয় চরিত্র)

ঘৃণা

ঘৃণা অর্থ কাউকে অত্যধিক অপছন্দ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, হীন ও নীচ মনে করা। ঘৃণার আরবি প্রতিশব্দ আল বুগদু (البغض), এর বিপরীত শব্দ الحب বা ভালোবাসা। অহংকার বশত নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও তার সাথে দূরত্ব বজায় রাখাই হলো ঘৃণা। কাউকে ঘৃণা করলে, তার কোনো কিছুই সহ্য হয় না। উভয়ের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মর্যাদাবান করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের সমাজের অনেকেই মানুষকে পেশাগত কারণে ও অর্থবিত্তের কারণে সম্মান করে বা ঘৃণা করে। আমাদের আশেপাশে লক্ষ করলেই দেখতে পাবো, অনেকে কথা-বার্তায় ও আচার-আচরণে অন্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। যেমন, অনেকে জুতো সেলাইকারী, রিক্সাচালক, ভ্যানগাড়ি চালক, পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে অবজ্ঞা করে কথা বলে তাদেরকে উপেক্ষা করে, তারা নিকটাত্মীয় হওয়ার পরও শুধু দরিদ্র হওয়ার কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে না।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ঘৃণা ও ঘৃণা প্রকাশক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়ে বলেন, 'হে মুমিনগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। কেননা, তারা উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোনো নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে। সে বিদ্রুপকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না ও একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১১)। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় পদ-পদবি, সামাজিক পদমর্যাদাও হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। তাই এসব কারণে কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাউকে ঘৃণা করলে, পরবর্তীকালে লজ্জা পেতে হয়। চাই সে ঘৃণিত ব্যক্তি ঘৃণাকারীকে লজ্জা দিক বা ঘৃণাকারী নিজে ঘৃণিত ব্যক্তির উন্নতি দেখে লজ্জা পাক।

সমাজে ঘৃণার প্রভাব ও পরিণতি

পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ সমাজের একটি ভীষণ নিন্দনীয় দিক। ঘৃণার কারণে সমাজে বিভেদ তৈরি হয়, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ সময় অহংকারবশত মানুষ অন্যকে ঘৃণা করে। অহংকারী মানুষ নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে হেয় করে কথা-বার্তা বলে, তাকে অপমান-অপদস্থ করে। এভাবেই সমাজে ঘৃণার প্রসার ঘটে। মানুষ যাতে নিজের উঁচু পদ-পদবি, অর্থ-বিত্ত, সামাজিক পদমর্যাদার কারণে অহংকার না করে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মাজিদে মানুষকে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?' (সূরা মুরসালাত, আয়াত: ২০)।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ঘৃণার প্রসার ঘৃণাকারী ও ঘৃণিত উভয়কে কষ্ট দেয়। যাকে ঘৃণা করা হয় তিনি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করেন। অন্যদিকে ঘৃণাকারী অন্যকে ঘৃণা করার কারণে মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। তার অন্তরের প্রশান্তি দূর হয়ে যায়। ঘৃণা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না বরং সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের রোগ তোমাদের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে। তা হলো হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর ঘৃণা (সৎকর্ম) ধ্বংস করে দেয়।' (তিরমিযি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন–

لَا تَبَاغَضُوْا ، وَلَا تَحَاسَدُوْا ، وَلَا تَدَابَرُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا ،
وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

অর্থ: 'তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, ষড়যন্ত্র করো না। তোমরা পরস্পর আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তাঁর ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে।' (বুখারি)

ইবলিস শয়তান অহংকারবশত হযরত আদম (আ.) এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। শয়তানের প্ররোচনায় আমরা অন্যকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করি। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করব যেন, আমরা কাউকে অন্যায়ভাবে ঘৃণা না করি। কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব।

আমাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা হবে আল্লাহর জন্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসে, আর আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহর জন্যই দান-সদাকা করে আবার আল্লাহর জন্যই দান-সদাকা করা থেকে বিরত থাকে তাঁর ঈমান পরিপূর্ণ হলো' (আবু দাউদ)। আমরা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষকে ভালোবাসবো, তাদের সাথে ওঠাবসা করবো। যারা পাপ কাজ করে ও পাপ কাজের প্রসারে সাহায্য করে, তাদের থেকে দূরে থাকবো।

যুলুম

যুলুম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো নির্যাতন বা অত্যাচার। সাধারণ অর্থে যার যা প্রাপ্য তাকে সেই প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম যুলুম। সে হিসেবে কারো অধিকার হরণ, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল, বিনা অপরাধে নির্যাতন, অন্যায়ভাবে কারো আর্থিক, দৈহিক, মানসিক ও মর্যাদার ক্ষতিসাধন, মানহানিকর অপবাদ দেওয়া, দুর্বলের ওপর নৃশংসতা চালানো, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ হরণ, উৎপীড়ন বা যন্ত্রণা প্রদান করা, কারো প্রতি ন্যায়বিচার না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি সবই যুলুমের পর্যায়ভুক্ত।

আর যে যুলুম করে, তাকে বলা হয় জালিম।

ইসলামে যুলুম কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে। যুলুমকারী সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি। হাদিসে কুদসিতে মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের জন্য যুলুম করা হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও যুলুম হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একজন অন্যজনের উপর যুলুম করো না।' (মুসলিম)

যুলুম একটি সামাজিক ব্যাধি। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এটি। অন্যের ওপর অন্যায় বা অবিচার করে জালিমরা নিজের পতন ও ধ্বংস ডেকে আনে। যুলুমের কারণে পুরো পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে এক সময় জালিম বা অন্যায়কারীর জীবনে নেমে আসে নানা বিপদ-আপদ। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি প্রদান করবেন' (মুসলিম)। আর এ শাস্তি শুধু মুসলমান নয়, কোনো অমুসলিমের ওপর যুলুম করলেও প্রযোজ্য।

মাজলুম বা নিপীড়িতের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। তাই মাজলুমের চোখের পানি ও অন্তরের অভিশাপ জালিমের পতনের কারণ হয়। মাজলুমের আর্তনাদের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জালিমদের ওপর নেমে আসে কঠিন শাস্তি। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত আসে না। এক. ইফতারের সময় সিয়ামপালনকারীর দোয়া। দুই. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া। তিন. মাজলুমের দোয়া।' (তিরমিযি)

আমাদের প্রিয় নবি (সা.) জালিমকে তার যুলুম থেকে প্রতিহত করার ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দিয়ে বলেন, 'মানুষ যদি কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দু'হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে, তবে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তাদের সবাইকে তাঁর ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন।' (তিরমিযি)। যুলুমকারী বড় হতভাগা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা কি জানো গরিব কে? সাহাবিগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নেই সে হলো গরিব লোক। তখন তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরিব, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের সম্পদ খেয়েছে, রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিকে সেদিন তার নেক আমল দিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম)

আমাদের উচিত যুলুম থেকে দূরে থাকা। কেননা জালিম যুলুম করে ঘুমিয়ে থাকলেও মাজলুম বা নির্যাতিত ব্যক্তি জেগে থাকে। সে জালিমের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকে। নিশ্চয়ই মাজলুমের বদদোয়ায় জালিমের জন্য ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে। যুলুম থেকে দূরে থাকার কার্যকর উপায় হচ্ছে ক্ষমতার লোভ, লালসা, হিংসা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, ক্রোধ থেকে আত্মসংবরণ করা, জনসেবা, ধর্মীয় সেবা, পরোপকারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা, বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থে পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকা।

যুলুমের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সব ধরনের যুলুম থেকে বিরত থাকা। সেই সাথে যুলুমের সহযোগিতা করা থেকে বেঁচে থাকা।

চুরি

অন্যের সম্পদ বা টাকা-পয়সা গোপনে নিজের হস্তগত করাকে আমরা চুরি বলি। চোরের পেশা বা কাজই চুরি করা।

চুরির কারণ

সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধির ফলে যখন অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় তখনই অভাবি-সুবিধা বঞ্চিত মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করে। অনেকে আবার লোভের বশবর্তী হয়ে চুরি করে। অনেক সময় সংঘবদ্ধ চক্র দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে চুরি করতে বাধ্য করে।

চুরির পরিণাম

চুরি একটি জঘন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ। চুরির কারণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। হঠাৎ করে সম্পদ হারিয়ে, সম্পদের মালিক নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। চোরের কারণে সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। সম্পদ হারনোর দুশ্চিন্তায় সবার মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

চোর চুরি করতে গেলে তার অপরাধ চুরির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে অন্যান্য অপরাধে জড়িয়ে যায়। এছাড়া অপরাধীদের চক্রের সাথে তার সখ্য গড়ে ওঠে। চুরির পাশাপাশি, ডাকাতি, ছিনতাই, চোরাকারবার, অপহরণ, পাচার, মাদকাসক্তিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে যায়।

সবাই চোরকে ঘৃণা করে। তার সাথে সম্পর্ক রাখে না। চোরের পরিবারের সদস্যরাও অপমানিত ও ঘৃণিত জীবন যাপন করে। নিকটাত্মীয় হলেও তার সাথে আত্মীয়তার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। দুনিয়া ও আখিরাতে চোরকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। কোনো মুমিন ব্যক্তি কখনো অন্যের সম্পদ চুরি করতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না’। (বুখারি)

চুরি করা হারাম। কোনো ব্যক্তি চুরি করাকে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

চুরির প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

১. ইসলামি অনুশাসন মেনে চলা

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা নিষেধ। আমরা কখনো অন্যের কোনো বস্তু ছোটো হোক বা বড় হোক, না বলে নিব না। কারণ ছোটো কিছু একবার চুরি করলে শয়তান অন্য কিছু চুরি করতে প্ররোচিত করে। আমরা যা কিছু করি আল্লাহ সবকিছু জানেন, এই বিশ্বাস চর্চা করতে হবে।

২. সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

ইসলাম দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছে। বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আশ্রয়হীন মানুষদের পুনর্বাসন করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো এলাকায় অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে চুরির মতো অপরাধ হ্রাস পায়।

৩. সচেতনতা বৃদ্ধি

অনেক সময় আমাদের সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ না করার ফলে চোর চুরি করে। আমাদের উচিত নিজের মালিকানাধীন সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ করা। সামর্থ্য থাকলে আমরা চুরি প্রতিরোধ করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা নিতে পারি। ইসলামে চুরির মাল ক্রয় নিষিদ্ধ। তাই কখনো যদি সন্দেহ হয় যে এটি চুরি করা দ্রব্য তাহলে আমরা সেটি ক্রয় করা থেকে বিরত থাকবো।

৪. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

ক্ষুধার যন্ত্রণা না থাকলে, অভ্যাসগতভাবে কেউ চুরি করলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একজন শাস্তি পেলে অন্যরা শাস্তির ভয়ে চুরি করা থেকে বিরত থাকবে।আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

অর্থ : 'পুরুষ চোর আর নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৩৮)

তবে মনে রাখতে হবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। চোরকে অনেক সময় গণপিটুনি দেওয়া হয় যেটা ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ এভাবে অনেক সময় নিরপরাধ মানুষ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শাস্তি পায়। গণপিটুনিতে অনেকের মৃত্যু হয়ে যায়। বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তি দিবেন।

তবে কোনো অবস্থাতেই প্রমাণিত অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত রাখা জায়েয হবে না। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, 'মাখযূম গোত্রের এক নারী চুরি করলে, মহানবি (সা.)-এর প্রিয় পালকপুত্র উসামা বিন যায়িদ (রা.) মহানবি (সা.) এর সাথে তার ব্যাপারে কথা বললেন। মহানবি (সা.) উসামা (রা.)-কে বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনকারিণীর শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করছ?' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্মানিত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে বিনা সাজায় ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদ (সা.) এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর হাত কেটে দিতাম।' (বুখারি)

ইসলাম অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করেছে, যাতে অভাবের তাড়নায় কেউ চুরি না করে। উমর (রা.) রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে নাগরিকদের খোঁজখবর নিতেন, প্রয়োজনে তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দিতেন। একইভাবে ক্ষুধার তাড়নায় কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কোনো এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও চুরির শাস্তি হিসাবে হাত কাটা যাবে না। কারণ তখন এমন অনেকেই চুরি করতে পারে, যে আসলে স্বভাবগতভাবে চোর নয়। আমাদের উচিৎ নিজে সচেতন হওয়া অন্যকে সচেতন করা।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

‘আখলাকে যামিমাহ বর্জন করে আমি নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখি’

উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে (পরিবার, বিদ্যালয়) আখলাকে যামিমাহ থেকে কীভাবে নিজেকে দূরে রাখো/রাখবে তা প্রতিফলন ডায়েরিতে লিখে আনবে। এক্ষেত্রে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য, সহপাঠী, শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।

মিথ্যা শপথ করা

প্রিয় শিক্ষার্থী! তোমরা দেখে থাকবে তোমাদের কতিপয় বন্ধুরা কথায় কথায় শপথ করে বলে আল্লাহর কসম আমি এটা করিনি, ওটা করিনি। এ রকম শপথ যদি মিথ্যা হয় তাহলে তা মারাত্মক গুণাহের কাজ। তাহলে এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহকে সামনে রেখে মিথ্যা বলা হলো।

আবার দেখবে অনেকে বিদ্যার শপথ করে, মায়ের শপথ করে। এগুলোও চরম অন্যায়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা যাবে না। দেখা যায় অনেকেই কুরআন ছুঁয়ে, মাথা ছুঁয়ে বা কারো নামে শপথ করে। ইসলামি বিধান মতে এগুলো শিরক ও সবচেয়ে বড় গুনাহ। মহানবি (সা.) বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করে, সে অবশ্যই শিরক করল।’ (তিরমিযি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করার মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, সে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম করে ফেলে।’ এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল! যদি তা নগণ্য জিনিস হয় তবুও?’ তিনি বললেন, ‘যদি একটা গাছের ডালও হয় তবুও।’ (মুসলিম)

ইসলামে মিথ্যা শপথ করা বা কসম করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া কবিরা গুনাহ বা বড় পাপের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ‘কবিরা গুনাহগুলো হচ্ছে, আল্লাহ

তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।' (বুখারি)

বাজারে অনেক দোকানদার পণ্য বিক্রয়ের জন্য শপথ করে বলে আল্লাহর কসম বিশ্বাস করেন এটা আমার এত দামে কেনা। এক্ষেত্রে যদি মিথ্যা শপথ করে অর্থাৎ পণ্যের দাম বাড়িয়ে শপথ করে বলে তবে কিয়ামতের দিন তার ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে।

মানুষকে ঠকানোর জন্য যে শপথ করা হয়, তার পরিণাম ভয়াবহ। এমনকি হাদিস অনুযায়ী সে সব শপথকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায় এবং জান্নাত হারাম করে দেওয়া হয়। সে হিসেবে সরকারি-বেসরকারি বড় পদ পেয়ে যারা শপথ পাঠ করেন, তাদেরকে সবসময় সাবধান থাকা খুব জরুরি, যাতে শপথের বিপরীত কিছু না হয়ে যায়। রাসুল (সা.) বলেন, 'কেউ (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলিমের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন এবং তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।' (মুসলিম)

আমাদের উচিত মিথ্যা শপথ করা থেকে বেঁচে থাকা। স্মরণ রাখতে হবে, অহেতুক শপথ করা ইসলাম সমর্থন করে না। আর মিথ্যা শপথ করাতো ইসলামে আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সত্য বিষয়ে দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য আল্লাহর নামে শপথ করা যেতে পারে।

অলসতা

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা নিশ্চয়ই এই বিখ্যাত উক্তিটি শুনেছ- 'পরিশ্রমে ধন আনে পূণ্যে আনে সুখ, অলসতায় দরিদ্রতা পাপে আনে দুঃখ'।

অলসতা মানব চরিত্রের একটি নেতিবাচক দিক। অলসতা মানে কর্মবিমুখতা। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা। অলস ব্যক্তি কর্মবিমুখ থাকে। নিষ্ক্রিয়, কর্মবিমুখ কিংবা উদ্যমহীন ব্যক্তিকে অলস বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। পরিশ্রমী ব্যক্তি জীবনে সফল হয়। মানুষ তাই পায়, যার জন্য সে প্রচেষ্টা চালায়। অপরদিকে অলস ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তন লাভ করতে পারে না। অলস ব্যক্তিদের দুইটি পন্থা-একটি হলো এটি পারবো না, অপরটি হলো ওটি দরকার নেই। যারা অলস, তাদের দিনশেষে অনেক ভোগান্তিও ভোগ করতে হয়।

অলসতা মুনাফিকদের আচরণ। মুনাফিকরা যখন সালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন অলসতা করে। সময়মত সালাত আদায় করে না। সালাতের আরকান আহকাম ঠিকমত পালন করে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এইজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে।' (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৫৪)'

আলসেমি নিজের ও সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে। অলসতা একটি জাতির উন্নতির পথে হুমকিস্বরূপ। অলসতা

মানুষের শিরাগুলো এমন ভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে লোহাকে মরিচা খেয়ে নেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে অলসতা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি বড় কারণ। ফুসফুসে নিয়মিত কর্মব্যস্ততা না থাকলে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। অলস ব্যক্তি সহজেই দম হারিয়ে ফেলে। নিজেকে অলস বানিয়ে রাখলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে শুরু করে।

অলসতা মানে নিস্ক্রিয় থাকা, কাজ থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ানো। এভাবে কাজ ফেলে রেখে দিলে পরবর্তীকালে অল্প সময়ে অনেক কাজ একসাথে করতে হয়। এতে কোনো কাজেরই গুণগতমান ভালো হয় না। আবার অনেক কাজই শেষ পর্যন্ত করা হয়েই উঠে না।

যে ব্যক্তি অলসতায় আচ্ছন্ন, সে কাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে না। বড় কোনো কিছু অর্জন করতে গেলে ছোট ছোট লক্ষ্য অর্জন করেই সামনে এগিয়ে যেতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেকে ভালোবাসা, নিজের কাজকে ভালোবাসা, নিজের অলসতা দূর করার জন্য নিজেই নিজেকে অনুপ্রাণিত করা।

অলসতা কাটানোর আরেকটি শক্তিশালী উপায় হলো, সফল ব্যক্তিদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া। পৃথিবীর সফল মানুষগুলো তাদের জীবনে কঠোর পরিশ্রম করেই সফল হয়েছেন। তাই অলসতা দূর করার জন্য সফল ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী পড়তে হবে, জানতে হবে। তাদের অনুসরণ করতে হবে। এই অনুপ্রেরণা তোমার আশেপাশের মানুষ বা তোমার প্রিয়জনের কাছ থেকেও আসতে পারে।

অলসতা কাজের ব্যাঘাত ঘটায়, শরীর ও মনে বিরূপ প্রভাব পেলে। ফলে মানুষ বিষণ্ণবোধ করে। তাছাড়া অলস মানুষ সমাজ-সংসারের কাছে অনেক বিদ্রুপের শিকার হয়। এসব থেকে বাঁচতে হলে পরিশ্রমী হতে হবে।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা তাদের দেখা অলস ব্যক্তিদের ব্যর্থতার চিত্র উল্লেখপূর্বক নিজেদের/পরিবারের সদস্যদের জীবনে পরিশ্রমের ফলে সফলতার গল্প উপস্থাপন করবে।

সুদ

সুদ আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার এক মারাত্মক অভিশাপ। এটি ধনীকে আরো ধনী আর গরিবকে আরো গরিব বানিয়ে দেয়। ইসলামে এটি হারাম।

সুদ এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلرِّبَا)। ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করাকে সুদ বলে। সুদের পরিচয় দিয়ে মহানবি (সা.) বলেছেন-

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

অর্থ : 'যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তাই রিবা বা সুদ।' (জামে সগির)

সুদের লেনদেন দু'ভাবে হতে পারে। টাকার মাধ্যমে এবং পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে। উভয় প্রকারের লেনদেনে সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সুদ বলে। রাসুল (সা.) হাদিসে ছয় প্রকারের পণ্যের নাম উল্লেখ করে বলেন- এগুলো সমান সমান নগদে নগদে বিক্রি করায় কোনো সুদ নেই, যদি কেউ আদান প্রদানে বেশি দেয় অথবা বেশি নেয় তাহলে তারা উভয়ে সুদের লেনদেন করল। গ্রহীতা এবং প্রদানকারী এক্ষেত্রে সমান।

সুদ হচ্ছে একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। এটি সমাজকে কলুষিত করে ঝগড়া ও বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যমে। অপরদিকে সুদের বিপরীত হচ্ছে হালাল ব্যবসা, যা সমাজে শান্তি আনে। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। তারা উভয়েই লাভবান হয়। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন অপরদিকে সুদকে হারাম করেছেন। কুরআনের বাণী-

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۚ

অর্থ: এটা এজন্য যে তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৭৫)

মহানবি (সা.) সুদদাতা, গ্রহীতা, সাক্ষ্যদাতা, লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন। হাদিসে এসেছে–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ،
وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

অর্থ: 'রাসুল (সা.) সুদদাতা, গ্রহীতা, সুদ-চুক্তির লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী।' (মুসলিম)

সুদী কারবার বান্দাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করে। আল্লাহ তা'আলা সুদ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। রাজাধিরাজ আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে পরাজয় সুনিশ্চিত।

সুদখোর যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। সুদ খেলে অন্তর কঠোর হয় এবং তাতে মরিচা পড়ে। সুদখোরের দোয়া ও ইবাদাত কবুল হয় না। আল্লাহ তা'আলা সুদের অর্থ দিয়ে সাদাকা করলে সেটা গ্রহণ করেন না। মহানবি

(সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তিনি শুধু পবিত্র মালই গ্রহণ করেন।'

সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত হলো আয়াতুর রিবা বা সুদ বিষয়ক আয়াত। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্তভাবে সুদকে হারাম করেছেন। আয়াতটি হলো-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

অর্থ : 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৭৮)।

এ ছাড়াও সুদের অনেক ক্ষতি রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তবে আমাদের জন্য এতটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা সেটাই হারাম করেন যার মধ্যে অনিষ্ট ও অকল্যাণ রয়েছে। যার বাহ্যিক লাভের চেয়ে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিই বেশি। তাই আমরা সুদ থেকে বেঁচে থাকব।

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি/তোমরা একটি তালিকা তৈরি করো।

আখলাকে যামিমাহ	বর্জন করি	বর্জন করবো	অভিভাবকের মতামত/পরামর্শ
চুরি	অন্যের লেখা নিজের নামে প্রচার করি না।	বিদ্যালয়ে, চলার পথে কারো কোনো বস্তু পড়ে থাকলে সেটি নিবো না।	অসেচতনতাভাবে কারো কোনো বস্তু নিজের কাছে চলে আসলে মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
যুলুম			
সুদ			

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনাদর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সহ কয়েকজন নবি-রাসুল এবং মুসলিম মনীষীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছো। নিশ্চয়ই তাঁদের জীবনাদর্শগুলো তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে তোমাদের নৈতিক মূল্যবোধ দৃঢ় করেছো।

৮ম শ্রেণির এই অধ্যায়ে তুমি আরো কয়েকজন নবি-রাসুল এবং মুসলিম মনীষীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবে।

বাড়ির কাজ

‘আমার প্রিয় ব্যক্তির যেসব গুণ আমি অনুসরণ করি’

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমার পছন্দের ব্যক্তির গুণাবলি তুমি যেভাবে অনুসরণ করো তা লিখে আনবে। প্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে পারে শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্য/প্রতিবেশি/সহপাঠী/শিক্ষক প্রমুখ।)

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)
(হিজরত থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত)

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.) -এর জন্ম, নবুওয়াত, কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন-প্রতিরোধ উপেক্ষা করে মক্কায় ইসলাম প্রচার, আল্লাহর দিদারে মি‘রাজ গমন এবং মদিনায় হিজরত পর্যন্ত জীবনচরিত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি। এ শ্রেণিতে তোমাদেরকে হিজরত পরবর্তী প্রিয়নবি (সা.)-এর ইসলাম প্রচার, মদিনা রাষ্ট্র গঠন, বদর, উহুদ, খন্দক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুদ্ধনীতি এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি ও এর তাৎপর্যসহ আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে জানবো।

মদিনায় হিজরত

৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (সা.) জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) হিজরতের সঙ্গী ছিলেন। মদিনায় যাত্রা পথে তাঁরা সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। ঘটনাচক্রে কাফিরদের একটি দল সাওর পাহাড়ের নিকটে এসে উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন নবি করিম (সা.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন–

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ

অর্থ: তুমি চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। (সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৪০)

পর্বতের গুহায় তাঁরা তিনদিন অবস্থান করেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.) তাঁদের জন্য গোপনে খাবার পৌঁছে দিতেন। এখানে ৩দিন অবস্থানের পর ৪র্থ দিনে তাঁরা লোহিত সাগরের অপরিচিত পথ ধরে ইয়াসরিবের দিকে যাত্রা করেন। ছয় দিনের অবিরাম যাত্রার পর ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার তিনি ইয়াসরিবের কয়েক মাইল দূরে কুবা নামক স্থানে পৌঁছেন। এখানে চার দিন থাকার পর ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মহানবি (সা.) মদিনায় (ইয়াসরিব) পৌঁছেন। ইসলামের ইতিহাসে মহানবি (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় গমনকেই হিজরত বলা হয়। মহানবি (সা.)-এর আগমনে খুশি হয়ে ইয়াসরিববাসী এর নতুন নাম রাখেন মদিনাতুন্নবি বা নবির শহর।

মদিনায় হিজরতের গুরুত্ব

মহানবি (সা.) -এর মদিনায় হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়। মুসলমানদের কষ্টের জীবনের অবসান ঘটে। ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশেপাশের অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। অল্প দিনের মধ্যেই মহানবি (সা.) মদিনার আউস, খাযরাজ, বনু নাযির, বনু কায়নুকা ও তাদের বন্ধু গোত্রসমূহ নিয়ে একটি ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হন। সকল গোত্র ও সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতি গঠন করেন। ফলে মদিনাবাসী নিজেদের কলহ-বিবাদ ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে মহানবি (সা.) সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হন।

মদিনা সনদ

মদিনায় এসে মহানবি (সা.) একটি আদর্শ জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি আরবদের চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করেন। তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন এবং সকলকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি একটি কল্যাণকর সমৃদ্ধ জাতি গঠন ও সর্বধর্মীয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য মদিনা ও আশেপাশের অঞ্চলসমূহের মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করেন। পৃথিবীর

ইতিহাসে এটা মদিনা সনদ (The Charter of Medina) নামে পরিচিত। এ সনদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা নিম্নরূপ:

মদিনা সনদ

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, এটা মহানবি মুহাম্মাদ (সা.) -এর পক্ষ থেকে লিখিত অঙ্গীকারনামা।

২. মদিনার পৌত্তলিক, ইহুদি এবং মুসলমান সবাই মিলে এক জাতি (উম্মাত)।

৩. মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

৪. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে মদিনার সকল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে সে আক্রমণকে প্রতিহত করবে।

৫. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা ও সাহায্য করতে হবে।

৬. এখন হতে মদিনায় রক্তপাত, হত্যা ও রাহাজানি নিষিদ্ধ করা হলো।

৭. স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে। সেজন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।

৮. কেউ কুরাইশদের সাথে কোনো প্রকার গোপন সন্ধি করতে পারবে না; কিংবা মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করতে পারবে না।

৯. চুক্তিপত্রের পক্ষগুলোর বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করলে পক্ষগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে এবং পক্ষগুলো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও কল্যাণকামিতা বজায় রাখবে।

১০. চুক্তির পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরিব একটি সংরক্ষিত ও পবিত্র নগরী হিসেবে বিবেচিত হবে।

১১. ইয়াসরিবকে কেউ আক্রমণ করলে চুক্তির সকল পক্ষ পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে।

১২. প্রতিবেশীকে নিজের মতোই গণ্য করতে হবে। তার কোনো ক্ষতি বা তার প্রতি কোনো অপরাধ করা যাবে না।

১৩. কোনো বিষয়ে যখনই মতানৈক্য হবে, তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

১৪. অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে, ভঙ্গ করা যাবে না।

মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মদিনা সনদ মহানবি (সা.) -এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। এই সনদে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে মদিনাবাসী একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মহানবি (সা.) মদিনা পুনর্গঠনের সুযোগ পান। ফলশ্রুতিতে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

এই সনদ মদিনার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এর ফলে শতধাবিভক্ত আরবদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। অনেক আগে থেকে চলে আসা গৃহযুদ্ধ ও অনৈক্যের পরিবর্তে ইয়াসরিবে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হয়। সর্বোপরি এই সনদের মাধ্যমে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামের সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, পরমতসহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামের বিধানসমূহ প্রবর্তন

মহানবি (সা.)-এর মদিনা জীবনের শুরুটা ছিল ইসলামের বিধান প্রবর্তনের সময়। মদিনা জীবনের শুরুতেই ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আজানের রীতি প্রবর্তিত হয়। ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাস -এর পরিবর্তে বায়তুল্লাহকে কেবলা নির্ধারণ করেন। একই বছরে মুসলমানদের জন্য রমযানের এক মাস সাওম পালনের বিধান প্রবর্তিত হয়। এ বছরেই মুসলমানদের প্রধান দু'টি ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপন শুরু হয়। এছাড়াও এই বছরে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাতের বিধান নাযিল হয়।

বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের পটভূমি

মদিনায় হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান, মর্যাদা ও শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। মদিনার ধর্মীয় সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বে মদিনার উন্নতি দেখে মক্কার কুরাইশরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা এবং মদিনার আশেপাশে লুটতরাজ শুরু করে। এসময় মদিনার মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবন উবাই-এর নেতৃত্বে একদল ইহুদি কুরাইশদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা মহানবি (সা.) ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনায় লিপ্ত থাকে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ার সাথে কুরাইশদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করায় তারা মদিনাকে তাদের বাণিজ্য পথের হুমকি মনে করে। এ হুমকি দূর করতে তারা একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মহানবি (সা.) কুরাইশদের এসকল অপতৎপরতার গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে মক্কার উপকণ্ঠে একটি দল প্রেরণ করেন। তখন ছিল রজব মাস। রজব মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নাখলা নামক স্থানে কুরাইশদের একটি দলের সাথে জাহাশের নেতৃত্বাধীন দলের খণ্ডযুদ্ধ সংঘঠিত হয়।

এতে কুরাইশদের দলনেতা আমর বিন হাযরামী নিহত হয়। নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করায় মহানবি (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশকে ভর্ৎসনা করেন। নাখলার এ ঘটনায় কুরাইশদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিশোধের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অবশেষে মদিনার মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা চূড়ান্ত রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে।

এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সিরিয়া থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। গুজবের সত্যতা যাচাই না করেই কুরাইশরা আবু জেহেলের নেতৃত্বে ১০০০ (এক হাজার) সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের এ সংবাদ জানতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ ওহি পাঠিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেন।

যুদ্ধের ঘটনা

মহানবি (সা.) মদিনার অদূরে বদর প্রান্তরে মুসলিম সৈন্য নিয়ে হাজির হন। তাঁর সঙ্গী হলেন ২৫৩ জন আনসার এবং ৬০জন মুহাজিরসহ মোট ৩১৩ জন সৈন্যের একটি দল। অপরপক্ষে মক্কার কাফিরদের ছিল ১০০০ (এক হাজার) সৈন্যের সুসজ্জিত দল। এর মধ্যে তিনশত অশ্বারোহী এবং সাতশত উষ্ট্রারোহী। মহানবি (সা.) যুদ্ধের শুরুতে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উপদেশ ও নির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় হিজরি ১৭ রমযান মোতাবেক ১৭ মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১০০০ জন সুসজ্জিত সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন ইমানি শক্তিতে বলিয়ান সৈন্য অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথমেই সম্মুখ যুদ্ধে কুরাইশদের নেতা উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ পরাজিত ও নিহত হয়। এরপর যুদ্ধের অল্পক্ষণের মধ্যেই মহান আল্লাহর সাহায্যে মুসলিম সৈন্যরা কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হলেন। ৬ জন মুহাজির ও ৮জন আনসারসহ মোট ১৪ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। অপরপক্ষে ৭০ জন কাফির-মুশরিক নিহত হয় এবং সমসংখ্যক সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয়।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে মহানুভবতা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বদরের যুদ্ধবন্দীদের সাথে সহানুভূতির মনোভাব পোষণের নির্দেশ দেন। ফলে মুসলিম সৈন্যরা যুদ্ধবন্দীদের সাথে উদার ও মানবিক আচরণ করেন। তাদের মধ্যকার বস্ত্রহীনদের বস্ত্র প্রদান করা হয়। তাঁদের খাদ্য প্রদান করা হয়। সবশেষে মুক্তিপণ নিয়ে আটক কুরাইশ সৈন্যদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে মুসলিম বালকদের শিক্ষাদানের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এমনকি ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না এ মর্মে ওয়াদা প্রদানের মাধ্যমেও অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি এমন মহানুভবতা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

যুদ্ধের গুরুত্ব

বদরযুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এটি ছিল সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফয়সালাকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় হয়। মক্কার কাফির-মুশরিকদের দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। মদিনা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া এত

অল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্য বিপুলসংখ্যক অমুসলিম সৈন্যের বিপরীতে জয়ী হওয়ার ফলে তাঁদের মনোবল ও ইমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। চূড়ান্তভাবে কুরাইশদের ক্ষমতা ও শক্তি খর্ব হয় এবং মহানবি (সা.)-এর শক্তি ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

এছাড়া কুরাইশদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া, উট এবং অন্যসামগ্রী লাভের মাধ্যমে মুসলমানদের পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। মদিনা ও আশেপাশের ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক ও ইহুদিদের উপর মুসলমানরা প্রভাব বিস্তার করে। সর্বোপরি আরবের বুকে ইসলাম এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

উহুদের যুদ্ধ

উহুদের যুদ্ধের পটভূমি

বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি মক্কার কুরাইশরা ভুলতে পারেনি। তারা বদরের প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। এ সময় মক্কার কবিরা তাদের কবিতায় মদিনার বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। কুরাইশ নারীরা তাদের পুরুষদেরকে আরো একটি যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে কুরাইশরা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আরেকটি যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

যুদ্ধের ঘটনা

তৃতীয় হিজরি সালে মক্কার কাফির-মুশরিকরা উমাইয়া নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ (তিন হাজার) সৈন্য নিয়ে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা মদিনার নিকটবর্তী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করে। কুরাইশদের মদিনা অভিযানের সংবাদ পেয়ে মহানবি (সা.) ১০০০ (এক হাজার) সৈন্যর একটি দল প্রস্তুত করেন। পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ৩০০ সৈন্যসহ সরে দাঁড়ায়। ফলে মহানবি (সা.) মাত্র ৭০০জন সৈন্য নিয়ে কুরাইশদের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হন। ২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে উভয় দল সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের শুরুতে মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণে কুরাইশরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় গিরিপথে পাহারারত মুসলিম সৈন্যদল এটিকে চূড়ান্ত বিজয় মনে করে গনিমতের মাল কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সুযোগে কুরাইশদের অশ্বারোহী দল পেছন থেকে আক্রমণ করে মুসলিম সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

যুদ্ধের ফলাফল

উহুদ যুদ্ধে ৭০জন মুসলিম বীর শাহাদাত বরণ করেন। আর মাত্র ২৩ জন কাফির মৃত্যুবরণ করে। নেতার আদেশ অমান্য করা এবং শৃঙ্খলাবোধের অভাবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় হয়। এছাড়া তৎকালীন মুশরিক নেতা খালিদ বিন ওয়ালিদের রণকৌশল মুসলমানদের বিপর্যয়ে ভূমিকা রেখেছিল।

যুদ্ধের গুরুত্ব

এ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের ধৈর্য ও ইমানের অগ্নিপরীক্ষা। সাময়িক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ ধৈর্য ও ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সাময়িকভাবে বিজয়ী হয়েও কুরাইশরা মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করতে সাহস করেনি। কোনো মুসলিমকে বন্দিও করতে পারেনি। অপরদিকে মহানবি (সা.) মুসলিম সৈন্যদের একটি দলকে

কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। এতে মুসলমানদের সাহস ও মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। তাঁদের সাময়িক বিপর্যয় ভবিষ্যৎ বিজয়ের পথকে উন্মোচিত করে। নেতার আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাঁরা সম্যকভাবে অবহিত হন। পরবর্তীকালে আর কোনো যুদ্ধে তাঁরা এ ভুল করেননি।

খন্দকের যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধের পটভূমি

মক্কার কুরাইশরা উহুদের যুদ্ধে সাময়িকভাবে জয়লাভ করলেও যেসব উদ্দেশে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, সেসবের কোনোটাই অর্জিত হয়নি। তারা মদিনায় রাসুল (সা.)- এর শক্তি, সম্মান ও মর্যাদা দুর্বল করতে পারেনি। সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্য পথও নিরাপদ হয়নি। তাছাড়া কুরাইশরা ফিরে যাওয়ার পরে মদিনার মুসলমানরা আরো বেশি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। তাই কুরাইশরা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং বাণিজ্যিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ সময় মদিনা শহরতলিতে বসবাসরত বেদুঈনরা তাদের লুটতরাজ বজায় রাখার জন্য কুরাইশদের সাথে আঁতাত শুরু করে দেয়। তাছাড়া উহুদ যুদ্ধের পর বনু নাযির গোত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের জন্য মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী লোকদের উসকানি দিতে থাকে। যার ফলে আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ, মদিনার পার্শ্ববর্তী বেদুঈন এবং মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদি এই তিনশক্তি একত্রিত হয়। তারা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে। এই ত্রিশক্তির ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) ৩,০০০ (তিন হাজার) সৈন্য সংগ্রহ করেন। তিনি শত্রু মোকাবেলার জন্য সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। সালমান ফার্সির পরামর্শক্রমে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মদিনার দক্ষিণ দিক ঘন খেজুর বাগান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল আর পূর্বদিকে বনু কুরাইযার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল। তাই মদিনার উত্তর ও পশ্চিম দিক অরক্ষিত ও উন্মুক্ত থাকায় এ দু'দিকে পরিখা খনন করা হয়। প্রায় ৩০০০ মুহাজির ও আনসার কঠোর পরিশ্রম করে এক সপ্তাহে খনন কাজ সমাপ্ত করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও খনন কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

খন্দক বা পরিখা খননের মাধ্যমে কাফিরদের মোকাবেলা করা হয়েছিল বলে এ যুদ্ধকে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। এছাড়া কাফির-মুশরিকদের বিভিন্ন দল একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বলে এ যুদ্ধ আহযাবের (আহযাব অর্থ দল বা সম্প্রদায়সমূহ) যুদ্ধ নামেও পরিচিত।

যুদ্ধের ঘটনা

কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে তাঁবু স্থাপন করে। তারা মদিনা শহর রক্ষায় মহানবি (সা.) -এর অভিনব কৌশল দেখে বিস্মিত হলো। ৩১ মার্চ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হলো। আবু সুফিয়ান ২৭ দিন মদিনা

অবেরোধ করে রাখেন। এ সময় কুরাইশবাহিনী পরিখা অতিক্রম করে হামলা চালাতে বারবার ব্যর্থ হয়। আস্তে আস্তে তাদের খাদ্য ও রসদের অভাব দেখা দেয়। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বাতাসে তাদের তাঁবুগুলো উড়ে যায়। ফলে আবু সুফিয়ান অবরোধ ত্যাগ করে মক্কার ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের ফলাফল

মহানবি (সা.) -এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, উন্নত রণকৌশল এবং গোয়েন্দাদের সফলতার কারণে মুসলমানরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করে। অপরদিকে কাফির-মুশরিক ও ইহুদিদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। মুসলমানদের ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং দৃঢ় মনোবলের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং খাদ্য-রসদের সংকট কাফিরদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কাফিরদের দম্ভ শেষ হয়ে যায়। তাদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তাদের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়। অপরদিকে মহানবি (সা.)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের ধর্ম ও বাণিজ্য প্রসারের সমস্ত বাধা দূর হয়। মদিনার পার্শ্ববর্তী ইহুদি ও বেদুঈন গোত্রের উপর মুসলমানরা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা স্বেচ্ছায় মুসলমানদের মিত্রে পরিণত হয়।

বনু কোরায়যা গোত্রের ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপট

মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ ৬ বছর মুসলমানরা পবিত্র হজ পালন করতে পারেননি। প্রিয় জন্মভূমির দর্শনও লাভ করেননি। তাই খন্দক যুদ্ধে জয়লাভের পর মুহাজিরদের মন স্বদেশে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মহানবি (সা.) তাদের অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারেন। তাই তিনি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের জিলকদ মাসে মাতৃভূমির দর্শন ও পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য ১৪০০ জন সাহাবিসহ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

যিলকদ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। তাই মহানবি (সা.) আশা করেছিলেন, এ মাসে বিধর্মীরা তাদেরকে বাঁধা দিবে না। তিনি সাহাবিদের নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা খালিদ ও ইকরামার নেতৃত্বে একটি দল পাঠিয়ে মুসলমানদের বাঁধা প্রদান করে। মহানবি (সা.) বুদাইল নামক ব্যক্তির মাধ্যমে কুরাইশদের জানালেন যে, তিনি শুধুমাত্র ওমরাহ পালন করে চলে যাবেন; এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্ত কুরাইশরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। মহানবি (সা.) আলোচনার জন্য উসমান (রা.)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। কিন্ত তারা আলোচনা না করে উসমান (রা.)-কে আটক করে। এদিকে হযরত উসমান (রা.) ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় মুসলমানদের মাঝে গুজব রটে যে, কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করেছে। তাই মুসলমানরা উসমান (রা.)- এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর হাতে আমরণ সংগ্রামের বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেন। এটিই ইতিহাসে বাইয়াতুর রেদওয়ান নামে পরিচিত। আল্লাহ

তা'আলা সূরা ফাতহের ১৮ নং আয়াতে বাইয়াত গ্রহণকারীদের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

সন্ধি স্থাপন

মুসলমানদের বাইয়াতের দৃঢ়তা কুরাইশদের মনে ভীতির সঞ্চার করলো। তারা উসমান (রা.)কে ছেড়ে দিল এবং সোহাইল বিন আমরকে সন্ধি স্থাপনের জন্য রাসুল (সা.)- এর নিকট পাঠালো। আলাপ-আলোচনার পর উভয় পক্ষের সম্মতিতে সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়। এটাই ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির উল্লেখযোগ্য শর্তসমূহ নিম্নরূপ:

১. মুসলমানগণ এ বছর হজ পালন না করে মদিনায় ফিরে যাবে।

২. আগামী বছর মুসলমানরা হজ করতে পারবে, কিন্তু তিনদিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। এ তিনদিন কুরাইশরা নগর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিবে।

৩. পরের বছর যখন তারা হজ করতে আসবে, তখন কেউই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসতে পারবে না। তবে আত্মরক্ষার জন্য শুধুমাত্র কোষবদ্ধ তরবারি আনতে পারবে।

৪. হজের সময় মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

৫. মক্কায় অবস্থানকারী কোনো মুসলমানকে মদিনায় নিয়ে যেতে পারবে না।

৬. যদি কোনো মুসলমান কুরাইশদের পক্ষে যোগ দেয় তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের দলে আসলে তার অভিভাবক চাইলে তাকে ফেরত দিতে হবে।

৭. আরবের যে কোনো গোত্র মহানবি (সা.) অথবা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

৮. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ১০ বছর বন্ধ থাকবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব

হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মুসলমানদের পরাজয় মনে হলেও এটা ছিল মুসলমানদের জন্য মহাবিজয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ফাতহুম মুবিন বা প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এ সন্ধির ফলে মুসলিম-অমুসলিমদের পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে মুসলমানদের আন্তরিকতা, উদারতা ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে কাফির-মুশরিকরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আসের মতো বীরদ্বয় এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সন্ধির পরে এত বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করে যে, মাত্র ২ বছরের মধ্যে রাসুল (সা.) ১০,০০০ সাহাবি নিয়ে মক্কা অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

এ সন্ধির ফলে মহানবি (সা.) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বীকৃতি লাভ করেন। শান্তির দূত হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়। কুরাইশরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে মেনে নেয়। এ সন্ধিতে ১০ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকার কথা ঘোষণা করা হয়, ফলে নিজ গোত্র কুরাইশদের সাথে মহানবি (সা.) -এর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। মহানবি (সা.) আপাতত কুরাইশদের শত্রুতা থেকে নিস্তার পেয়ে নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। এসময় তিনি রোম সম্রাট, পারস্য-সম্রাট, আবিসিনিয়ার নাজ্জাশি প্রমুখের কাছে দূত পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মোটকথা, হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

প্যানেল আলোচনা

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনাদর্শ (সম্প্রীতি, সহাবস্থান, ধৈর্য, ত্যাগ) তুমি বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা করবে তা দলে/প্যানেল আলোচনা করে উপস্থাপন (পোস্টার) করো।

হযরত ইবরাহিম (আ.)

পরিচিতি

হযরত সালেহ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর মানুষ এক আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিপূজা ও নক্ষত্র পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুপথে আনার জন্য ইবরাহিম (আ.)-কে নবিরূপে প্রেরণ করেন। তিনি পশ্চিম ইরাকের বসরার নিকটবর্তী ‘বাবেল’ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আজর। তিনি একজন প্রসিদ্ধ নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁকে আবুল আম্বিয়া বা নবিগণের পিতা বলা হয়। তাঁর স্ত্রী সারার পুত্র ইসহাক (আ.)- এর বংশধর ‘বনি ইসরাইল’ নামে পরিচিত। অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাইল (আ.)- এর বংশে জন্ম নেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ (সা.)।

নবুওয়াত লাভ ও তাওহিদের দাওয়াত

হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সঠিক সময় জানা যায়নি। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাল্যকাল হতেই সঠিক জ্ঞান ও হেদায়েত দান করেছিলেন। তাঁর উপর দশটি সহিফা নাযিল হয়। ইবরাহিম (আ.) দেখলেন তাঁর জাতি চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, মূর্তি ইত্যাদির পূজায় ব্যস্ত। এ পরিস্থিতিতে ইবরাহিম (আ.) তাদেরকে অত্যন্ত নম্রভাবে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা এক আল্লাহর প্রতি ইমানের দাওয়াত দিলেন। আল্লাহর সাথে শিরক করতে নিষেধ করলেন। মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু তারা ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর তিনি বাদশাহ নমরুদকে ইমানের দাওয়াত দিলেন। এতে নমরুদ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইবরাহিম

(আ.)-কে আগুনে ফেলে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নমরুদের নির্দেশে ইবরাহিম (আ.)-কে হাত পা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। ইবরাহিম (আ.) তখনও আল্লাহর উপর ভরসা করলেন। আল্লাহ তা'আলা আগুনকে ইবরাহিম (আ.)-এর জন্য শীতল হওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রজ্জ্বলিত আগুন ইবরাহিম (আ.)-এর জন্য শীতল ও পরম আরামদায়ক হয়ে গেল। তাঁর হাত-পায়ের রশিগুলো আগুনে পুড়ে গেল। মহান আল্লাহর রহমতে নিরাপদে তিনি অগ্নিকুন্ড থেকে বের হয়ে আসলেন।

হিজরত

নমরুদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মহান আল্লাহর হুকুমে হযরত ইবরাহিম (আ.) জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে দ্বীন প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি স্ত্রী সারা ও ভাতিজা হযরত লুতকে সঙ্গে নিলেন। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে সেখানে দ্বীন-ই-হানিফের প্রচার শুরু করেন। এভাবে দাওয়াত দিতে দিতে ইবরাহিম (আ.) সিরিয়া অথবা ফিলিস্তিনের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

স্ত্রী ও পুত্রকে মক্কায় নির্বাসন ও যমযম কূপের সৃষ্টি

বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম (আ.)-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন। তাঁর স্ত্রী হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর জন্ম হয়। আল্লাহর নির্দেশে তিনি হাজেরা আর ইসমাইলকে বর্তমান কাবাগৃহের নিকটবর্তী একটি গাছের নিচে রেখে আসেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে সামান্য পানি ও খেজুর রেখে আসেন।

কিছুদিন পর খেজুর ও পানি দু'টোই শেষ হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী হাজেরা পানি ও খাবারের জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। সাতবার ছোটাছুটির পরও কোনো খাবার ও পানি পেলেন না। অতঃপর তিনি ইসমাইলের নিকট ফিরে আসলেন। এসে দেখলেন, শিশু ইসমাইল পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছে। আর আল্লাহর কুদরতে সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। হযরত হাজেরা পানি ধরে রাখার জন্য বাঁধ দিলেন। তিনি নিজে পানি পান করলেন এবং ইসমাইলকেও পান করালেন। এটাই হলো যমযম কূপের উৎস।

ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানি

ইসমাইল (আ.)-যখন ১৩ বা ১৪ বছরের বালক, তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) একাধারে তিনরাত স্বপ্নে পুত্র ইসমাইলকে কুরবানির জন্য আদিষ্ট হলেন। এ স্বপ্নের পর ইবরাহিম তাঁর পুত্রকে বললেন, 'হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি কুরবানি করছি। এখন তোমার অভিমত কী?' ইসমাইল বললেন, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তাই করুন।' পুত্রের সম্মতি পেয়ে ইবরাহিম (আ.) মিনা প্রান্তরে যান। সেখানে প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করতে শুরু করলেন।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাইল (আ.)-এর স্থলে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায়ও তিনি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন।

কাবাঘর পুনর্নির্মাণ

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সর্বপ্রথম কাবাঘর নির্মাণ করেন। নূহ (আ.)-এর সময় প্লাবনে কাবার কাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মহান আল্লাহ ইবরাহিম (আ.)-কে কাবাঘর পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) মিলে বায়তুল্লাহ তৈরির কাজ শুরু করেন। ইসমাইল (আ.) পাথর এনে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এভাবে পবিত্র কাবাঘরের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়।

গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য

ধৈর্য, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ইবরাহিম (আ.)- এর অন্যতম চারিত্রিক গুণাবলি। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, বিপদে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, প্রতিকূল অবস্থায় ইমানের ওপর টিকে থাকা, হেকমতের সাথে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন তিনি। হযরত ইবরাহিম (আ.) মেহমানদারিতে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর খুবই প্রিয়ভাজন খলিল বা বন্ধু ছিলেন।

ইন্তেকাল

হযরত ইবরাহিম (আ.) ১৭৫ মতান্তরে ১৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে কানআনে অবস্থিত হেবরন নামক গ্রামে দাফন করা হয়। গ্রামটি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে উক্ত স্থানের নামকরণ করা হয়েছে মদিনাতুল খলিল।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

হযরত ইবরাহিম (আ.) এর জীবনাদর্শের কোন কোন দিকগুলোতে ত্যাগের মহিমা ফুটে উঠেছে বলে তুমি মনে করো?

পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা/মতবিনিময়ের মাধ্যমে লিখে আনবে।

আমার পরিবারের সদস্য	হযরত ইবরাহিম (আ.) এর ত্যাগ সম্পর্কে মতামত
বাবা	আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে হিজরত করেন।
মা	
ভাই	
বোন	

হযরত উসমান (রা.)

জন্ম ও পরিচয়

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে ৫৭৩ মতান্তরে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আমর এবং আবদুল্লাহ। তাঁর উপাধি 'যুননুরাইন' ও 'জামেউল কুরআন'। তাঁর পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ। উসমান (রা.) বড় ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য তিনি 'উসমান গনি' নামে পরিচিত ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত উসমান (রা.)- এর বয়স যখন ৩৪ বছর তখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) আবির্ভূত হন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)- এর দাওয়াতে তাঁর মন ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তিনি রাসুল (সা.)- এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিবাহ

তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর দুই কন্যা রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। প্রথমে রাসুল (সা.) তাঁর কন্যা রুকাইয়াকে হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট বিয়ে দেন। রুকাইয়া মারা গেলে হযরত উসমান (রা.) হযরত উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। এ কারণে তাঁকে উপাধি দেওয়া হয় 'যুননুরাইন' বা দুই জ্যোতির অধিকারী। রাসুল (সা.) তাঁকে এত পছন্দ করতেন যে, উম্মে কুলসুমের ইন্তেকালের পর বলেছিলেন, 'যদি আমার আরও কন্যা থাকত, তাকেও আমি হযরত উসমান (রা.)- এর কাছে বিয়ে দিতাম। রাসুল (সা.) আরো বলেন, বেহেশতে প্রত্যেক নবিরই একজন বন্ধু থাকবে, আর আমার বন্ধু হবে হযরত উসমান (রা.)।

প্রথম হিজরতকারী

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর চাচা হাকাম নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল। যখন শাস্তির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল, রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াকে নিয়ে অন্যান্য সাহাবিসহ আবিসিনিয়ায় বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। সেখানে দুই বছর থাকার পর মক্কায় ফিরে এসে তিনি মদিনায় হিজরত করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে মিলিত হন।

কূপ ক্রয় ও মসজিদ সম্প্রসারণ

মুহাজিরগণ যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন সেখানে বিশুদ্ধ পানির খুবই অভাব ছিল। মদিনায় এক ইহুদির মালিকানাধীন 'বীরে রুমা' নামক একটি কূপ ছিল। ইহুদি এ কূপের পানি চড়া দামে বিক্রি করত। মুহাজিরগণের পানি ক্রয় করে পান করার সামর্থ্য ছিল না। মুসলমানরা মহানবি (সা.)- এর কাছে এসে পানির সংকটের কথা জানালেন। মহানবি (সা.) ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছে যে এই কূপটি কিনে মুসলমানদের

জন্য ওয়াকফ করে দিবে? এটা যে করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে একটি ঝরনা দান করবেন।' তখনই হযরত উসমান (রা.) কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

এছাড়াও হযরত উসমান (রা.) মসজিদে নববির পাশের জায়গা উচ্চমূল্যে ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দান করেন।

ইসলামের সেবা

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন প্রথম ওহি লেখক। তিনি নিজের ধন-সম্পদের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাবুক অভিযানের ব্যয় বহনের জন্য তিনি নগদ ১০০০ দিনার, ১০০০টি উট, ৭০টি ঘোড়া এবং সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করেন। শুধু বদরের যুদ্ধে স্ত্রী অসুস্থ থাকার কারণে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কুরাইশদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে গিয়েছিলেন।

খলিফা হিসেবে দায়িত্বলাভ

হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ৬ সদস্যের নির্বাচনী পরিষদ গঠন করেন। তাঁদের মধ্যে এ পরিষদের ৬জন ছিলেন হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত জোবায়ের (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত আবদুর রহমান (রা.)। হযরত আবদুর রহমান (রা.) স্বীয় দাবি প্রত্যাহারপূর্বক ভোটদানে বিরত থেকে রাত জেগে নির্বাচনী পরিষদের প্রতিটি সদস্যের গৃহে গমন করেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেন। অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন।

কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.)- এর অসামান্য কৃতিত্ব হলো কুরআন মাজিদ সংকলন। হযরত ওমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)- এর সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন মাজিদ পাঠ ও উচ্চারণে অসঙ্গতি নিরসনে যায়েদ বিন সাবিত (রা.)- এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)- এর নিকট সংরক্ষিত কুরআন মাজিদের পাণ্ডুলিপি থেকে অনুরূপ আরো ৬টি কপি সংকলন করেন। ৪টি কপি বসরা, কুফা, দামেস্ক ও মক্কায় প্রেরণ করেন এবং বাকি ২টি কপি মদিনায় রাখেন। এভাবে তিনি পবিত্র কুরআন সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত উসমান (রা.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি রাসুল (সা.)- এর জামাতা ও ফুফাতো ভাই ছিলেন। তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী, দানশীল ও পুণ্যবান ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সর্বদা তাঁর চক্ষু সজল থাকত। মহানবি (সা.) যখন কবরের আলোচনা করতেন, তখন তাঁর চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যেত। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করতেন, 'আপনি জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা শুনলেও এত কাঁদেন না। অথচ কবরের আলোচনায় এত কাঁদেন কেন?' তখন তিনি বলতেন, 'কবর হলো পরকালের প্রথম ধাপ, যদি এখানে

আমি বিপদগ্রস্ত হই, তবে পরবর্তী সকল ধাপে বিপদগ্রস্ত হব।'

তিনি অত্যন্ত দানশীল ও জনসেবক ছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক রাস্তা, সেতু, মসজিদ, বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।

ইন্তেকাল: হযরত উসমান (রা.) ১২ বছর খিলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে ৮২ বছর বয়সে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাহাদতবরণ করেন।

একক কাজ

'হযরত ওসমান (রা.) এর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি যে যে কাজ বাস্তব জীবনে চর্চা/অনুশীলন করবে'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি শ্রেণিতে নির্ধারিত ছকটি পূরণ করো।)

ক্রমিক	গুণাবলী	যেভাবে চর্চা/অনুশীলন করব
১.	পরোপকারী	বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করব।
২.		
৩.		
৪.		

হযরত ফাতিমা (রা.)

পরিচয়

হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন মহানবি (সা.)-এর আদরের কনিষ্ঠা কন্যা। হযরত আলী (রা.)-এর স্ত্রী। তাঁর উপাধি ছিল যাহরা। তাঁর মাতা ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)। তিনি ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর শারীরিক অবয়ব, কথা বার্তা, স্বভাব প্রকৃতি ও চলাফেরার ধরন ছিল অবিকল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মত। এই মহীয়সী নারীর যাপিত জীবন সকল মুসলিম নারীর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি জান্নাতি নারীগণের নেত্রী হবেন।

হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ

মহানবি (সা.) দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ফাতিমার বিবাহ দেন। হযরত আলী (রা.) বদর যুদ্ধ প্রাপ্ত লৌহ বর্ম উসমান (রা.)-এর নিকট ৪৮০দিরহামে বিক্রি করেন। বিক্রিত অর্থ দিয়ে বিবাহের মহর ও অন্যান্য খরচ সমাধা করেন। হযরত আলী (রা.)-এর তেমন কোনো আসবাবপত্র ছিলো না। এমন কি কোনো দাস-দাসীও ছিলো না। তাই ফাতিমা (রা.)-কেই ঘরের সব কাজ করতে হতো। যাঁতাকল ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর

হাতে ফোসকা পড়ে যায়। মশক ভর্তি পানি টানতে টানতে তাঁর কোমরে দাগ হয়ে যায়। আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.) এর এই বরকতময় সংসারে মোট পাঁচজন সন্তান জন্ম লাভ করেন। তাঁরা হলেন, যয়নব, হাসান, হুসাইন, মুহসিন ও উম্মে কুলসুম।

হাদিস শাস্ত্রে অবদান

হযরত ফাতিমা (রা.) সর্বমোট ১৮টি হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন, হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আয়েশা, হযরত উম্মে কুলসুম, হযরত সালমা, হযরত উম্মে রাফে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) প্রমুখ সাহাবির নাম উল্লেখযোগ্য।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন একজন আদর্শ জননী; একজন আদর্শ স্ত্রী; একজন আদর্শ সমাজ-সেবিকা; একজন সত্যবাদী ও পুণ্যবতী নারী। রাত জেগে তিনি ইবাদাত করতেন। প্রায়ই রোযা রাখতেন।

দানশীলতা

হযরত ফাতিমা (রা.) গরিব-দুঃখীকে অতিমাত্রায় দান-খয়রাত করতেন। একদিন একজন আরব বৃদ্ধ মুহাজির রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসেন। ঐ বৃদ্ধ লোকটি বলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাদ্যদান করুন। আমার পরনে কাপড় নেই, আমাকে পরিধেয় বস্ত্রদান করুন। আমি নিঃস্ব, দরিদ্র, আমাকে দয়া করে কিছু দিন।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আমার কাছে এখন দেওয়ার মতো কিছু নেই। তুমি ফাতিমার বাড়িতে যাও। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলও তাকে ভালোবাসে। সে আল্লাহর পথে দান করে থাকে।' বৃদ্ধ লোকটি ফাতিমা (রা.) -এর বাড়িতে গেলেন। ফাতিমা (রা.)- এর কাছে তার প্রয়োজনের কথা খুলে বললেন। অথচ হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত আলী (রা.) ও রাসুল (সা.) তিনদিন যাবত কিছু খাননি। হযরত ফাতিমা দুম্বার চামড়া বিশিষ্ট হাসান ও হুসাইনের বিছানাটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'হে দরজার বাহিরে দণ্ডায়মান ব্যক্তি! এটা নিয়ে যাও। আশা করি আল্লাহ তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন'।

আরব বৃদ্ধটি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কন্যা! আপনার কাছে আমি ক্ষুধা নিবারণের কথা বলেছি আর আপনি আমাকে পশুর চামড়া দিচ্ছেন। আমি এ চামড়া দিয়ে কী করবো? হযরত ফাতিমা বৃদ্ধ লোকটির কথা শুনে তাঁর গলার হারটি খুলে তাকে দান করে দিলেন। আর বললেন, 'এটাকে নিয়ে বিক্রি কর। আশা করি আল্লাহ তোমাকে এর চেয়ে আরো উত্তম কিছু দান করবেন'। এভাবে তিনি তাঁর প্রিয় বস্তু দানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে অনুসরণীয় হয়ে রইলেন।

বদান্যতা

একবার হযরত ফাতিমা (রা.) হস্তচালিত যাঁতাকল দিয়ে আটা তৈরি করছিলেন। যাঁতাকলের হাতল ঘুরাতে গিয়ে ফাতিমা (রা.)-এর হাতের ক্ষতস্থান হতে রক্ত বের হচ্ছিল। তখন শিশু হুসাইন তাঁর পাশে বসে ক্ষুধায় কাঁদছিলেন। একজন সাহাবি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসুলের কন্যা! আপনার হাতে ক্ষত হয়ে গেছে। 'ফিদ্দা' (ফাতিমার গৃহপরিচারিকার নাম) তো আপনার ঘরেই আছে।' তখন ফাতিমা বললেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে আদেশ করেছেন যে, পালাক্রমে একদিন ফিদ্দা ঘরের কাজ করবে। আর আমি অন্য একদিন। তার পালা গতকাল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার পালা।'

ইন্তেকাল

মহানবি (সা.) ইন্তেকালের ছয়মাস পর হিজরি ১১ সালের রমযান মাসে হযরত ফাতিমা ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসিয়ত অনুসারে জানাযা দিয়ে তাঁকে রাতে দাফন করা হয়।

হযরত শাহ জালাল (রহ.)

হযরত শাহ জালাল (রহ.) ছিলেন একজন কামেল ওলি। তিনি একজন হিদায়েতের পথ প্রদর্শক, আধ্যাত্মিক সাধক এবং ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

জন্ম ও পরিচয়

হযরত শাহ জালাল (রহ.) ৬৭১ হিজরি মোতাবেক ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানেই প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতার নাম মাহমুদ। শাহ জালাল তিন মাস বয়সে মাতাকে হারান। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতাও মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মামা আহমদ কবির তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।

শৈশবকাল

হযরত শাহ জালাল (রহ.) তাঁর মামা ও শিক্ষাগুরু আহমদ কবিরের নিকট কুরআন-হাদিসসহ ইসলামের মৌলিক বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে শাহ জালালকে তাঁর মামা ইয়েমেন থেকে মক্কায় নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে শরিয়ত ও মারেফত (তাসাউফ)- এর শিক্ষা দান করেন। এছাড়াও তৎকালীন আলেমদের থেকে তিনি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দ্বীনি বিষয়াদি শিক্ষা লাভ করেন। তাতে তিনি ইসলামের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ইসলাম প্রচার

হযরত শাহ জালাল (রহ.) আল্লাহর দ্বীনের প্রচারক ছিলেন। তিনি ৭০৩ হিজরি মোতাবেক ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতীয় উপমহাদেশে হিজরত করেন। সিলেটের প্রথম মুসলমান শেখ বোরহান উদ্দিন (রহ.)-এর উপর রাজা গৌরগোবিন্দ অবর্ণনীয় অত্যাচার করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত শাহজালাল (র.) ৩৬০ আউলিয়াসহ সিলেটে আগমন করেন। একপর্যায়ে তাঁর সাথে জালিম রাজা গৌরগোবিন্দের এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল্লাহর রহমতে হযরত শাহ জালাল (রহ.) ও তাঁর অনুসারীরা জালিম রাজাকে পরাজিত করেন। তাঁর মামা মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ কবীর (র.) তাঁকে এক মুঠো মাটি দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, 'স্বাদে বর্ণে গন্ধে এই মাটির মতো মাটি যেখানে পাবে, সেখানে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করবে।' সিলেটের মাটির সাথে আরবের মাটির মিল পাওয়া যায়। তাই হযরত শাহজালাল (র.) সিলেটে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। তিনিই সর্বপ্রথম সিলেট এলাকায় উচ্চস্বরে আযান দেওয়ার প্রচলন করেন। অতঃপর তিনি ইসলাম প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করেন। সিলেট অঞ্চলে তার মাধ্যমেই ইসলামের প্রসার ঘটে। তিনি আদর্শজীবনের অধিকারী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতেন। তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক মাধুর্য ও অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হয়ে অনেক মানুষ তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর হাতে এ দেশের

অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন'। তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে যে অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা উপমহাদেশে বিরল।

কারামত

শাহ জালাল (রহ.)-এর জীবন অসংখ্য কারামতে পরিপূর্ণ। তিনি জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ৩৬০ জন সঙ্গীসহ সুরমা ও বরাক নদী পার হয়ে গিয়েছিলেন। ইবন বতুতাও তাঁর সফরনামায় শাহ জালাল (রহ.)-এর বেশ কিছু কারামত উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবন বতুতা যখন তাঁর সাথে দেখা করতে সিলেট আসলেন, পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, শাহ জালাল (রহ.) তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাঁর মুরিদদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অথচ ইবন বতুতা তাঁকে আগে খবর পাঠিয়ে আসেননি।

ইন্তেকাল

হযরত শাহজালাল (রহ.) দীর্ঘ ২৩ বছর ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত থেকে ৭৪০হি./১৩৪১ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

হযরত শাহ জালাল (রহ.) ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনার এক বিস্ময়কর প্রতীক ছিলেন। তিনি নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন এবং রাতে ইবাদত করতেন। কাল পরিক্রমায় তিনি নিষ্ঠাবান দাঈদের জন্য আদর্শে পরিণত হলেন।

দলীয়/প্যানেল আলোচনা

হযরত ফাতিমা (রা.) এবং হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনাদর্শ তুমি বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা করবে, তা দলে/প্যানেল আলোচনা করে উপস্থাপন (পোস্টার) করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরমতসহিষ্ণুতা

প্রিয় শিক্ষার্থীরা!

পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ আমাদের চারপাশের মানুষজনের সাথে কীভাবে সহাবস্থান করবো ও সম্প্রীতি বজায় রাখবো। এ সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা জেনে তোমাদের কথা ও কাজে এ গুণ দুটির বিশেষ চর্চা অব্যাহত রেখেছো নিশ্চয়ই। এ শ্রেণিতে তোমরা পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে জেনে তোমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে তা অনুশীলন করবে। অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অপরকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তুমি পরমতসহিষ্ণু হতে পারো। এছাড়া কেবল নিজে মত দেওয়া নয়, নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতে পারো। পরমতসহিষ্ণুতা মানুষের মৌলিক মানবিক গুণাবলির মধ্যে অন্যতম একটি গুণ। এটি একটি সুন্দর শিষ্টাচার। মানব চরিত্রে এ গুণটির অনুপস্থিতি বিশেষত পরিবার ও সমাজ জীবনে নানা বিভেদ, অনৈক্য ও অশান্তি সৃষ্টি করে। ইসলাম আমাদের সবসময় পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। ইসলামের শিক্ষার আলোকে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে এ মহৎ গুণটি চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমে আলোকিত মানুষ হতে বদ্ধপরিকর। পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা বিস্তারিত জানার পূর্বে এ অধ্যায়ের শুরুতে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা এতদসংক্রান্ত একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করবো। তাহলে শুরু করা যাক-

মতবৈচিত্র্য’ ছক পূরণ তোমরা নির্ধারিত ছকটি বাড়ি থেকে পূরণ করে আনবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার পরিবারের সদস্য/বন্ধু/শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।	
নিজের মত জোর করে চাপিয়ে দিলে যা হতে পারে	অন্যের মতকে গুরুত্ব দিলে যা হবে
১। ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি হয়।	১। শান্তি বজায় থাকে।

পরমতসহিষ্ণুতা হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে কারো কথা, কাজ বা ব্যবহারে কোনো রকম ক্রোধান্বিত বা প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতার সাথে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করাই পরমতসহিষ্ণুতা।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিত্রের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা অন্যতম। পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্রকে আরো উজ্জ্বল করেছে। মহানবি (সা.) ও খলিফাগণ অন্যের মতামত ও বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইতিহাসে তার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে সহিষ্ণুতা গুণটি অর্জনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলাম মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নির্দেশনা দিয়েছে। অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোনোভাবেই আঘাত করা যাবে না। মক্কায় যারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত তারা একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল, ‘আপনি কিছু দিন আমাদের নিয়মে উপাসনা করুন, আমরাও আপনার নিয়মে উপাসনা করব।’ এই প্রস্তাব শুনে তিনি তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য না করে ধৈর্যধারণ করলেন। এমন সময় ওহি নাযিল হলো, ‘আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা করছো। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার’। (সূরা কাফিরুন, আয়াত: ৪-৬)

মহানবি (সা.) -এর পরমতসহিষ্ণুতার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রণয়ন করেন মদিনা সনদ, যা পরমতসহিষ্ণুতার প্রকৃত উদাহরণ।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তির শুরুতে কুরাইশ প্রতিনিধি ‘রাসুলুল্লাহ’ লিখতে আপত্তি জানায়। সাহাবিগণ কিছুতেই এই প্রস্তাব মানছিলেন না। কিন্তু মহানবি (সা.) আল্লাহর রাসুল হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে কলম দিয়ে ‘রাসুলুল্লাহ’ শব্দটি কেটে দিয়ে ‘মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ’ (আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ) লিখে দিলেন। শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) এ প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। তিনি পরমতসহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুমহান চরিত্র ছিল উদারতা, শান্তিপূর্ণ সমঝোতা ও পরমতসহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জন্মভূমি মক্কাবাসীর ঠাট্টা-বিদ্রুপ, অত্যাচার-নির্যাতন চরমে পৌঁছালেও তিনি কিছুতেই সহিষ্ণুতা হারাননি। হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা ও তায়িফ বিজয়ের সময় যে অতুলনীয় ক্ষমার আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। তা বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না, মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো’। (সুরা হা-মিম সাজদাহ, আয়াত: ৩৪)

ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য নিজের মত বা বিশ্বাস অন্যের ওপর

চাপিয়ে দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অপরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু না হওয়ার শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ইমান আনত; তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে'? (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯)

যে কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় বিতর্কে প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এ কারণে ইসলাম আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ইসলামের দাওয়াত প্রদানে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সহিষ্ণুতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত :৮)। তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বা সমালোচনার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রামাণ্য যুক্তি ব্যতিরেকে বক্তব্য প্রদান উচিত নয়।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'আমি বাস্তব জীবনে যেভাবে পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা করব'

উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি একটি তালিকা তৈরি করে আনবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার পরিবারের সদস্য/সহপাঠী/শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।)

পরিবারে যেভাবে চর্চা করবো	বিদ্যালয়ে যেভাবে চর্চা করবো

ইসলামে সকলের প্রতি মার্জিত সম্বোধনের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এখানে ইসলামের অনুসারী এবং ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি। কেননা ভদ্র ও মার্জিত 'সম্বোধন' সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আল-কুরআনের বিভিন্ন 'সম্বোধন' থেকে আমরা মার্জিত সম্বোধনের দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকি। মহান আল্লাহ নিজেকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ সকল শ্রেণির মানুষকে একত্রে একই ভাষায় সম্বোধন করেছেন। কখনও তিনি 'হে মানব সম্প্রদায়', কখনও 'হে মানব জাতি', কখনও 'হে কিতাবধারী' বলে সম্বোধন করেছেন। জাতি, ধর্ম, গোত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহর এই আহ্বান নিঃসন্দেহে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতার অনন্য শিক্ষা। ইসলামের এই 'মার্জিত সম্বোধন' ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আল কুরআনের মার্জিত ও মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে।

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে বিনয়ী হওয়া অপরিহার্য। কুরআন মাজিদে বর্ণিত মুসা (আ.) ও ফিরাউনের মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনয়ী ও কোমল আচরণের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সর্বোপরি ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করেছে। অন্যের মতামতের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে। তবে কোনো উগ্র মতামত ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য সমর্থন করে না। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব বিধিবিধান আছে। ধর্মচর্চার নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এক্ষেত্রে নিজের ধর্মকে মানার পাশাপাশি অন্যকে তার ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেওয়াই ইসলামের শিক্ষা।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষার্থীরা!

তোমরা নিজেদের জীবনে কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করবে এ নিয়ে গল্প/কবিতা/অনুচ্ছেদ/নাটিকা লিখে আগামী সেশনে (ক্লাস) নিয়ে আসবে। তোমাদের লেখাগুলো দিয়ে তোমরা একটি ম্যাগাজিন তৈরি করবে, যা তোমাদের বিদ্যালয় লাইব্রেরি বা সুবিধাজনক জায়গায় তোমরা সংরক্ষণ করবে। তাহলে তোমরা তোমাদের লেখাগুলো যত্নসহ লেখা শুরু করো এবং শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক ম্যাগাজিন তৈরি করো।

- নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী ম্যাগাজিন তৈরির কাজ শুরু করছো। তাহলে চলো শুরুতেই আমাদের মতামতের ভিত্তিতে ম্যাগাজিনের একটি সুন্দর নাম ঠিক করি।
- শিক্ষকের নির্দেশনা মতো তোমরা কয়েকজন সবগুলো লেখা সংগ্রহ করে একসঙ্গে যুক্ত করো।
- শিক্ষকের সহায়তায় লেখাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সুবিধাজনকভাবে বাঁধাই করো। (ম্যাগাজিনের জন্য তোমাদের নির্বাচিত নামটি প্রথম পৃষ্ঠায় (কাভার পৃষ্ঠা) ব্যবহার করো)।
- ম্যাগাজিনটি তৈরি হলে সকলের পড়ার বা দেখার জন্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বা সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ করবে।

৬৬

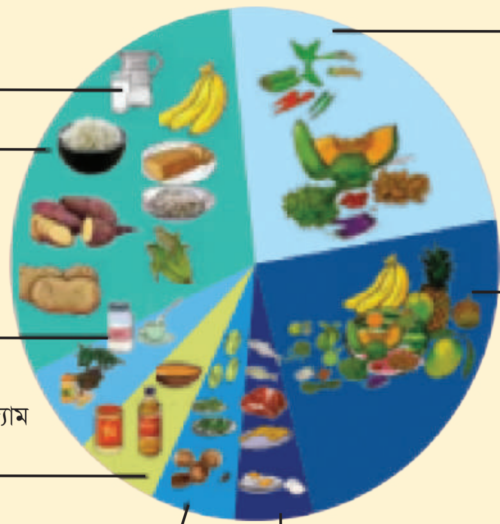

রোগ প্রতিরোধে সুষম খাবার

চাহিদা অনুযায়ী শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি খাদ্য উপাদান যতটুকু দরকার আমাদের খাদ্য তালিকায় সেই উপাদানগুলো ততটুকু থাকলেই তা সুষম খাদ্য।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

ইসলাম শিক্ষা

পৃথিবীতে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না

–আল কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য